উসূলে ফিক্বহ
ফিক্বহের মূলনীতি

মুহাম্মাদ ইবনে ছলীহ আল উসাইমীন

الاصول من علم الاصول

আল-উসূল মিন ইলমিল উসূল
(উসূলে ফিক্বহ বা ফিক্বহের মূলনীতি)

الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

মূল: ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল-উছাইমীন

المترجم : حضرت علي محمد

অনুবাদ: মাওলানা মোঃ হযরত আলী

শিক্ষক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

مراجعة :عبد العليم بن كوثر

সম্পাদনা: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر :مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইলঃ ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইলঃ ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৯ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশঃ জুলাই ২০২০ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্যঃ ১০০ (একশত) টাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	الموضوع	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	كلمة المترجم	অনুবাদকের কথা	০৪
২.	مقدمة المؤلف	লেখকের ভূমিকা	০৬
৩.	أصول الفقه	উসূলুল ফিক্বহ	০৭
৪.	الأحكام	আল আহকাম/ শারঈ বিধি-বিধান	১১
৫.	أقسام الأحكام الشرعية	শারঈ বিধি-বিধানের প্রকারভেদ	১২
৬.	العلم	ইলম/ জ্ঞান	২০
৭.	الكلام	কালাম/ বাক্য	২২
৮.	الأمر	আমর /আদেশ	৩৪
৯.	النهي	নাহী /নিষেধ	৪০
১০.	العام	‘আম /ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ	৪৯
১১.	خاصٌّ	খাছ্ব / নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ	৫৬
১২.	المطلق والمقيد	মুত্বলাক্ব (শর্তহীন) ও মুক্বাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত) শব্দ	৬৬
১৩.	المجمل والمبين	মুজমাল ও মুবাইয়্যান শব্দ	৬৯
১৪.	الظاهروالمؤول	যাহের ও মুআওয়াল	৭২
১৫.	النسخ	নাসিখ/রহিতকরণ	৭৫
১৬.	الأخبار	খবর (হাদীছসমূহ)	৮৩
১৭.	الإجماع	ইজমা	৯২
১৮.	القياس	ক্বিয়াস	৯৬
১৯.	التعارض	আত-তা‘আরুদ্ব বা পরস্পরবিরোধিতা	১০৪
২০.	الترتيب بين الأدلة	দলীলের মাঝে স্তর বিন্যাস	১১২
২১.	المفتي والمستفتي	মুফতী ও ফাতাওয়া প্রার্থী	১১৩
২২.	الاجتهاد	ইজতিহাদ	১১৫
২৩.	التقليد	তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ)	১১৮
২৪.	المراجع	গ্রন্থপঞ্জী	১২৪

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ তা'আলার জন্য। যিনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে ঈমানের মত অমূল্য সম্পদ দান করে ধন্য করেছেন। আজীবন প্রশংসা করে যার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। দরূদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। যার জীবন ধারা বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে আমরা একান্তভাবে অভিলাষী-প্রয়াসী। তার জীবন চরিতকে ঘিরেই আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম তৎপরতা আবর্তিত হয়। শান্তি বর্ষিত হোক ছাহাবা (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহুম) আজমাঈনের প্রতি, যারা জীবন বাজি রেখে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। তার মিশনকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কবুল করুন। কিয়ামতের দিন তাদের কাতারে শামিল করুন। আমীন!

অতঃপর মহান রবের আবারো শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার মতো এক নগন্য ব্যক্তিকে তার মহান দীনের কিছু খেদমতের ধারায় যুক্ত করেছেন। দয়ালু আল্লাহ এ নগন্যকে সৌদি আরবের একজন সর্বজন মাননীয় ব্যক্তিত্ব শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন রচিত 'আল উসূল মিন ইলমিল উসূল' নামক কিতাবের অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজনের তাওফীক দিয়েছেন। শাইখের উক্ত কিতাবটি উসূলে ফিক্বহ বা ইসলামী প্রায়োগিক শাস্ত্র বিষয়ক মূলনীতি সম্পর্কিত একটি সুসমন্বিত কিতাব। তিনি কিতাবটিতে উসূলে ফিক্বহ-এর মৌলিক নিয়ম-নীতিগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। আসলে শাইখ ছ্বলিহ আল উছাইমীন মানেই রাজা-প্রজা, ছোট-বড় নির্বিশেষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব। কাজেই তাকে ও তার লেখনীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অবকাশ রাখে না। যাহোক সম্মানিত শাইখের কিতাবটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে খোদ সৌদি আরবের কিছু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি পাঠ্যক্রমভুক্ত হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোতেও কিতাবটি সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। কিতাবটি আমাদের মাদরাসাতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা রয়েছে। এটি পড়াতে গিয়ে আমার ছাত্রসহ অনেকেই কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ করার পরামর্শ দেন। অতঃপর মাকতাবাতুস সুন্নাহর সত্ত্বাধিকারী ডাক্তার মোশাররফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি উৎসাহ প্রদান করেন। সেই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলার ফযলে কিতাবটি প্রকাশ পায়। আলহামদু লিল্লাহ।

কিতাবটি খোদ সৌদি আরবেই মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যক্রম হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে মাদরাসাগুলোতে এই কিতাবটি যারা পড়েন, তারা এই বিষয়ে একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের বলা যায়। সেদিকটি বিবেচনা করে, অনুবাদ কর্মটি আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছি। কেননা শুধু আক্ষরিক অনুবাদ করলে বাংলা ভাষাগত মান ঠিক থাকে না। আবার নিছক ভাবানুবাদ করলেও তার সাথে আরবি ইবারতের সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে তুলনামূলক দুর্বল ছাত্রদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। ফলে কিতাবটি সর্বজন উপযোগী করার জন্য ভাষাগত ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছি।

উসূলে ফিক্বহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয় হলেও আমাদের মাদরাসাগুলোতে এর তেমন দারস-তাদরীস ছিল না। বর্তমানে অবশ্য প্রায় সব মাদরাসাতেই এর পঠন-পাঠন চলছে। কিছু বিদ্বান জমহুর বিদ্বানের অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই ইলমকে ‘হাদীছ কাঁটার কাঁচি’ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত ফিক্বহুল হাদীছ বা হাদীছের বুঝ নির্ভর করে উসূলে ফিক্বহের উপর। আমাদের সালাফ আলেমদের কিতাব অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হয় যে, এই ইলমে তাদের বিচরণ ছিল অবাধ।

অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করতে যারা আমাকে পদে পদে প্রেরণা যুগিয়েছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমার ছাত্র আল আমীন ও যুবাইর অত্যন্ত কষ্ট করে টাইপের কাজে সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তা‘আলা এদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করুন।

অনুবাদের ভাবোদ্ধারে আশা করি বড় ধরনের ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হবে না। তবে কিতাবটির অনুবাদ কর্ম খুব স্বল্প সময়ে করা হয়েছে। এজন্য এখানে অনাকাঙ্খিত কিছু ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকদের মূল্যবান মতামত, পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসগুলো কবুল ও মঞ্জুর করুন এবং একে আমাদের পরকালের নাজাতের অসীলা করুন। আমীন।।

মোঃ হযরত আলী
দাওরা হাদীছ, মাদরাসা দারুল হাদীছ, পাবনা।
অনার্স ও মাস্টার্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
শিক্ষক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউট, দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭৮০-৪২৭২৩২

مقدمة المؤلف- লেখকের ভূমিকা

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি। তার কাছে সাহায্য চাই। তার কাছে ক্ষমা চাই। তার নিকটে তাওবা করি। আমরা আশ্রয় চাই আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং আমাদের মন্দ কর্ম থেকে। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। আমি আরোও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল। আল্লাহ তা'আলা রহমত করুন তার উপর, তার পরিবার-পরিজনের উপর, তার ছাহাবীদের উপর এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপর। তিনি তাদের উপর অবিরত শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

অতঃপর এটি উসূলে ফিক্বহ বা প্রায়োগিক শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। 'আল-মা'আহিদুল ইলমিয়্যাহ'-এর মাধ্যমিক স্তরের তৃতীয় বর্ষের উপযোগী করে এটি আমি লিপিবদ্ধ করেছি এবং নাম দিয়েছি-

الأصول من علم الأصول (ফিক্বহ শাস্ত্রের মূলনীতি)

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের কর্মগুলোকে তার জন্যই একনিষ্ঠ করেন, তার বান্দাদের জন্য উপকারী করেন। নিশ্চয়ই তিনি সন্নিকটে, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী ।

লেখক: শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

أُصُول الفِقْه
উসূলে ফিক্বহ

সংজ্ঞা: **أُصُول الفِقْه 'উসূলে ফিক্বহ'** কথাটি দু'দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। প্রথমত: শব্দ দু'টি এককভাবে অর্থাৎ أُصول **'উসূল'** এবং الفِقْه **'ফিক্বহ'** এর শাব্দিক পরিচিতি।

الأُصول 'আল **উসূল'** শব্দটি أَصل 'আসল' এর বহুবচন। আর أَصل বলা হয়, যার উপর অন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই দেওয়ালের মূল ভিত্তিকে أصلالجدار বলা হয়। আরো বলা হয়, أصلالشجرة বা বৃক্ষমূল, যা থেকে ডাল-পালা বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء

'তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? উত্তম বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত' *(সূরা ইবরাহীম ১৪:২৪)*।

الفِقْه এর আভিধানিক অর্থ[১]: বুঝা, অনুধাবন করা। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

'আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(সূরা ত্ব-হা ২০:২৭)*।

পারিভাষিক অর্থ:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

---

১. বুঝা (فَهْمٌ), জানা (عِلْمٌ), অনুধাবন করা (إِدْرَاكٌ), বিচক্ষণতা (فِطْنَةٌ), শিক্ষা লাভ করা, দক্ষতা অর্জন করা।

‘ফিক্বহ হলো বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে শরী‘আতের কর্মগত বিধি-বিধানগুলো জানা।

সুতরাং আমাদের কথা: **معرفة** (জানা) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিশ্চিত জানা, প্রবল ধারণার ভিত্তিতে জানা। কেননা, ফিক্বহী বিধি-বিধানগুলো জানা কোন সময় নিশ্চিতভাবে হয়, আবার কোন সময় প্রবল ধারণামূলক হয়। যেমনটা ফিক্বহের অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে দেখা যায়।

আমাদের কথা: **الأحكام الشرعية** (শারঈ আহকাম) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরী‘আত থেকে প্রাপ্ত বিধি-বিধান। যেমন: ওয়াজিব, হারাম ইত্যাদি।

সুতরাং এর দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিক বিধি-বিধান বুঝাবে না। যেমন: এটা জানা যে, ‘পূর্ণ কিছু আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর। এর দ্বারা অভ্যাসগত বা প্রাকৃতিক বিধি-বিধানও বুঝাবে না। যেমন: শীতের রাতে যখন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে, তখন শিশির পড়ার বিষয়টি জানা।

العملية (কর্মগত) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়। যেমন: ছ্বলাত, যাকাত ইত্যাদি।

সুতরাং এর দ্বারা আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝাবে না। যেমন: আল্লাহ তা‘আলার একত্ব, তার নামসমূহ, গুণাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে জানা। এগুলিকে পারিভাষিক ক্ষেত্রে ফিক্বহ হিসাবে অভিহিত করা হবে না।[২]

---

২. অনেক উসূলবিদ ফিক্বহ এর সংজ্ঞায় **الْعَمَلِيَّة** (কর্মগত) শব্দের স্থলে **الفرعية** (শাখাগত) শব্দ বলেছেন। সুতরাং তাদের নিকট ফিক্বহ এর সংজ্ঞা হলো,

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفرعية بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

“ফিক্বহ হলো বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে শরী‘আতের শাখাগত বিধি-বিধানগুলো জানা।”

সম্মানিত লেখক এখানে ফিক্বহের সংজ্ঞায় শাখাগত বিধান না বলে কর্মগত বিধান বলেছেন। কারণ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ শরী‘আতের বিধি-বিধানকে মৌলিক ও শাখাগত এভাবে ভাগ করাকে নাকচ করেছেন। তিনি বলেন, এভাবে ভাগ করা বিদ‘আত। আল্লাহ ও তার রসূলের কথায় এর কোন ভিত্তি নেই। কারণ এতে ছ্বলাতকে শাখাগত বিষয় হিসাবে অভিহিত করা হয়। অথচ এটি দীনের চূড়ান্ত পর্যায়ের মৌলিক বিষয়! সুতরাং এ বিভাজন কে নিয়ে আসলো?! বস্তুত এ বিভাজন নিয়ে এসেছে মু‘তাযিলা, জাহমিয়া ও অন্যান্য বিদ‘আতী দলের লোকেরা। (মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১৯/২০৭-২১০)

بأدلتها التفصيلية (শারঈ বিস্তারিত দলীল) এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফিক্বহের বিস্তারিত মাসআলাসমূহের সাথে সম্পর্কিত ফিক্বহের দলীলসমূহ।

সুতরাং **بأدلتها التفصيلية** দ্বারা **أصول الفقه** ঝুঝাবে না। কেননা **أصول الفقه** শাস্ত্রে সংক্ষিপ্ত দলীলসমূহ আলোচিত হয়।

দ্বিতীয়ত: একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের নাম হওয়ার দিক দিয়ে উসূলে ফিক্বহের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। সুতরাং এর সংজ্ঞা হলো:

عِلْمٌ يَبْحَثُ عَن أَدِلَّةِ الْفِقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادِ مِنْهَا وَحَالِ الْمُسْتَفِيْدِ.

'উসূলে ফিক্বহ এমন জ্ঞান/ বিদ্যা, যা ফিক্বহের সংক্ষিপ্ত দলীল, তা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি ও উপকার লাভকারী তথা মুজতাহিদ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে।

আমাদের কথা: **الإجمالية** (সংক্ষিপ্ত দলীল) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **القواعد العامة** বা সাধারণ/ব্যাপক নিয়ম-নীতি। যেমন: উসূলবিদদের কথা-'নির্দেশ' ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা দেয়। 'নিষেধ' হারাম হওয়ার ফায়দা দেয়। 'শুদ্ধতা' বাস্তবায়নের দাবি করে।[৩] এর দ্বারা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ বুঝাবে না। সে কারণে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের আলোচনা উসূলে ফিক্বহে উল্লেখিত হবে না। তবে শুধুমাত্র নিয়ম-নীতির উদাহরণ হিসাবে তা পেশ করা হবে।

আমাদের কথা: **وكيفية الإستفاد منها** (তা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শব্দের মর্মার্থ ও তার বিধি-বিধান তথা عموم (ব্যাপক অর্থ প্রদান করা), خصوص (নির্দিষ্ট হওয়া), إطلاق (শর্তহীন হওয়া), تقييد (শর্তযুক্ত হওয়া), ناسخ (রহিতকারী), منسوخ (রহিত) ইত্যাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে দলীলসমূহ থেকে শারঈ বিধি-বিধান কিভাবে পাওয়া যায়, তা অবগত হওয়া। নিশ্চয় এটি জানার মাধ্যমেই ফিক্বহের দলীলসমূহ থেকে তার বিধি-বিধান পাওয়া যাবে।

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

আমাদের কথা: **وحال المستفيد** (উপকার লাভকারীর অবস্থা) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপকার লাভকারী ব্যক্তির অবস্থা জানা। আর উপকার লাভকারী ব্যক্তি হলেন মুজতাহিদ। তাকে **مستفيد** নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু তিনি ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছার কারণে নিজেই দলীলসমূহ থেকে বিধি-বিধানগুলো লাভ করেন। সুতরাং মুজতাহিদের পরিচয়, ইজতিহাদের শর্ত, হুকুম ইত্যাদি বিষয় উসূলে ফিক্বহে আলোচনা করা হয়।

فائدة أصول الفقه–উসূলে ফিক্বহের উপকারিতা

উসূলে ফিক্বহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন একটি জ্ঞান, যা খুবই উপকারী। এর উপকারিতা হলো এমন সক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করা, যার দ্বারা দলীলসমূহ থেকে শারঈ বিধি-বিধান নিরাপদে বের করা যায়।

সর্বপ্রথম এ ইলম একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে গ্রন্থাবদ্ধ করেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ শাফে'ঈ রহিমাহুল্লাহ।[৪]

অতঃপর অনেক আলিম এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করেন এবং এ বিষয়ে গদ্য-পদ্য, সংক্ষিপ্ত-বিস্তারিত বিভিন্ন ধরনের কিতাব রচনা করেন। আর এভাবেই 'উসূলে ফিক্বহ' অনন্য বৈশিষ্ট্য ও অবকাঠামোর অধিকারী একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হয়।

---

৪. উসূলে ফিক্বহ বিষয়ে প্রথম কে কিতাব রচনা করেছেন, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ফখরুদ্দিন রাযী, ইবনে খালদুন, বদরুদ্দিন যারকাশী, জুওয়াইনী, আল্লামা সুবকী, ইবনু খাল্লিকানসহ অধিকাংশ বিদ্বানের মতানুসারে এ বিষয়ে প্রথম কিতাব রচনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ)। তার কিতাবের নাম 'আর রিসালাহ'। (আল ইবহাজ ফী শারহিল মিনহাজ, আত তামহীদ ফী তাখরীজিল উসূল আলাল ফুরু' প্রভৃতি।) কিছু হানাফী আলেম দাবী করেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) প্রথম এ বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। আবার কেউ বলেন, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ প্রথম কিতাব লিখেছেন। কিছু শীআ দাবী করে যে, তাদের ইমাম মুহাম্মদ বাকের আলী বিন যাইনুল আবেদীন প্রথম কিতাব লিখেছেন। কিন্তু এসব দাবীর পক্ষে তেমন কোন দলীল প্রমাণ নেই। আর এদের কোন কিতাবের সন্ধানও পাওয়া যায় না। এজন্য কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, যদি ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরাও দাবী করে যে, তারাই এ বিষয়ে প্রথম কিতাব লিখেছে, তবুও তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

الأحكام

আল আহকাম /শারঈ বিধি-বিধান[৫]

الأحكام শব্দটি **حكم** এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ফায়ছালা করা। পারিভাষিক অর্থ:

ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.

‘মুকাল্লাফ বা (শরী‘আতের) ভার অর্পিত ব্যক্তিদের কর্মের সাথে সম্পর্কিত শরী‘আতের খেত্বাব বা সম্বোধনের যে দাবী, তাকে আহকাম বলে। যেমন: তলব (আদেশ-নিষেধ), তাখয়ীর (বৈধ), ওয়ায‘উন (বাস্তবায়ন করা বা না করার বৈশিষ্ট্য)।’

خطاب الشرع (শরী‘আতের খেতাব বা সম্বোধন) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও সুন্নাহ।[৬]

المتعلق بأفعال المكلفين (মুকাল্লাফ ব্যক্তির কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট) এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা তাদের আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট; সেটা কথা হোক অথবা কর্ম, করণীয় হোক অথবা বর্জনীয় হোক। সুতরাং উক্ত বক্তব্য দ্বারা আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝাবে না। অতএব, এ পরিভাষা অনুসারে আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ‘হুকুম’ হিসাবে অভিহিত করা হবে না।

---

৫. আল-আহকাম (বিধি-বিধান): মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, শারঈ বিধি-বিধান একক আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রণিত। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পক্ষ থেকে ঐ সব বিধানের প্রচারক। হোক তা সরাসরি নছ (দলীল) অথবা ইজতেহাদ আল্লাহ তা‘আলা তা অনুমোদন দিয়েছেন।

৬. যেহেতু কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমেই শরী‘আত প্রণেতা আমাদেরকে বিভিন্ন কর্মের নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সম্বোধন করেন, এজন্য কুরআন ও হাদীছকে খেতাব বা সম্বোধনের মাধ্যম হিসাবে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য, ইজমা ও ক্বিয়াসকে খেতাব বলা হয় না। কেননা, এগুলির মাধ্যমে শরী‘আত প্রণেতা আমাদেরকে সম্বোধন করেন না। এগুলি মূলতঃ কুরআন-সুন্নাহ উৎসারিত প্রশাখাগত দলীল।

আমাদের বক্তব্য: **المكلفين** (শরী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যাদের বৈশিষ্ট্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া একথা দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য। সুতরাং এটি শিশু ও পাগলকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

আমাদের বক্তব্য: من طلب (কোন তলব) একথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আদেশ ও নিষেধ। চাই তা আবশ্যকতার ভিত্তিতে হোক অথবা উত্তমতার ভিত্তিতে হোক।[৭]

আমাদের বক্তব্য: أو تخيير (ঐচ্ছিকতা) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুবাহ বা বৈধ বিষয়।[৮]

আমাদের বক্তব্য: أو وضع (প্রতীকী বিধান) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুদ্ধ, অশুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় যেগুলিকে শরী'আত প্রণেতা কোন কাজ বাস্তবায়ন করা অথবা বাতিল করে দেয়ার বিশেষণ ও প্রতীক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

أقسام الأحكام الشرعية

শারঈ আহকাম বা বিধি-বিধানের প্রকারভেদ

শারঈ আহকাম দু'ভাগে বিভক্ত:

(ক) الأحكام التكليفية-দায়িত্বমূলক বিধি-বিধান

(খ) الأحكام الوضعية -প্রতীকী বিধি-বিধান।

(ক) الأحكام التكليفية-দায়িত্বমূলক বিধি-বিধান পাঁচ প্রকার:

১. ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় বিধান)।

২. মানদূব (পালন করা বাঞ্ছনীয়)।

---

৭. তলব অর্থ চাওয়া, দাবী করা প্রভৃতি। উসূলে ফিক্বহ শাস্ত্রে তলব বলতে শারঈ আদেশ ও নিষেধ বুঝায়। অর্থাৎ কোন কাজ করা বা না করার দাবীকেই তলব বলে।

৮. শরী'আত প্রণেতা কর্তৃক কোন কাজ করা বা না করার ঐচ্ছিকতা প্রদানকে তাখয়ীর বলে। যেমন: সফরে ছিয়াম পালন করা।

৩. হারাম (পালন করা নিষিদ্ধ)

৪. মাকরূহ (পালন করা নিন্দনীয়)

৫. মুবাহ (পালন করা বৈধ)[৯]

১. ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় বিধান): ওয়াজিবের আভিধানিক অর্থ বিচ্যুত, পতিত, আবশ্যকীয়। পারিভাষিক অর্থ:

مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ.

'শরী'আত প্রণেতা আবশ্যকতার ভিত্তিতে যা পালনের আদেশ করেন, তাকে ওয়াজিব বলে।' যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত।

আমাদের বক্তব্য: ما أمر به الشارع (শরী'আত প্রণেতা যা আদেশ করেন) এ কথা দ্বারা হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ বিষয় বুঝাবে না।[১০]

আমাদের বক্তব্য: على وجه الإلزام (আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালনের) এ বাক্যাংশ দ্বারা মানদূব বুঝাবে না।[১১]

আর ওয়াজিব এমন বিষয়কে বলে, যা আনুগত্যের ভিত্তিতে পালনকারী ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে এবং বর্জনকারী শাস্তির যোগ্য হবে। এটিকে ফরয, ফারীযা, হাত্ম, লাযেম নামেও অভিহিত করা হয়।[১২]

---

৯. শরী'আত প্রণেতা আমাদেরকে যেসব কর্ম আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালন করতে বলেন সেটি ওয়াজিব; যা উত্তমতা বা ঐচ্ছিকতার ভিত্তিতে বলেন সেটি মানদূব বিবেচিত হয়। অপরদিকে যেসব কর্ম আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালন করতে নিষেধ করেন সেটি হারাম; যা সাধারণভাবে নিষেধ করেন, সেটি মাকরূহ বিবেচিত হয়। আর যেসব কর্মের সাথে কোন আদেশ-নিষেধ থাকে না, তাকে বলা হয় মুবাহ ।

১০. ما أمر به الشارع (শরী'আত প্রণেতা যা আদেশ করেন) একথা দ্বারা হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ বিষয় আলাদা হয়েছে। হারাম ও মাকরূহ আলাদা হওয়ার কারণ হলো হারাম ও মাকরূহ এর ক্ষেত্রে আদেশ করা হয় না, বরং নিষেধ করা হয়। মুবাহ আলাদা হওয়ার কারণ হলো, এতে কোন আদেশ থাকে না।

১১. মানদূব আলাদা হওয়ার কারণ হলো, এখানে আদেশ থাকলেও আবশ্যিকভাবে পালনের নির্দেশ থাকে না।

১২. অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, ওয়াজিব ও ফরয একই বিষয়। কিন্তু হানাফীদের নিকট 'ফরয' হলো তাই, যা অকাট্ট দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। যেমন: কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীছের মাধ্যমে সাব্যস্ত অবশ্য পালনীয় কর্ম। পক্ষান্তরে দলীলে যন্নী বা প্রবল ধারণা ভিত্তিক দলীল অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদ-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হলে তা 'ওয়াজিব' গণ্য হবে। অনুরূপভাবে দলীলে

২. মানদূব (পালন করা বাঞ্ছনীয়): আভিধানিক অর্থে মানদূব অর্থ আহূত, কাঙ্খিত, বাঞ্ছনীয়। পারিভাষিক অর্থ:

مَا أَمَرَ بِه الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْه الْإِلْزَام.

'সাধারণভাবে শরী'আত প্রণেতা যেসব বিষয়ে আদেশ করেন, কিন্তু তা আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালন বুঝায় না, তাকে মানদূব বলে।' যেমন: ফরয ছ্বলাতসমূহের আগে-পরে পালনীয় সুন্নাতসমূহ।

আমাদের বক্তব্য: ما أمر به الشارع (শরী'আত প্রণেতা যা আদেশ করেন) একথা দ্বারা হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ বিষয় মানদূব থেকে পৃথক হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য: لا على وجه الإلزام (আবশ্যকতার ভিত্তিতে পালনীয় নয়) একথা দ্বারা ওয়াজিব থেকে আলাদা হয়েছে।

মানদূব এমন বিষয়কে বলা হয়, যা আনুগত্যের ভিত্তিতে পালনকারীকে ছাওয়াব দেওয়া হবে। তবে পরিত্যাগকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না। একে সুন্নাত, মাসনূন, মুস্তাহাব ও নফল নামে অভিহিত করা হয়।

৩. হারাম (পালন করা নিষিদ্ধ): হারাম শব্দের আভিধানিক অর্থ বারণকৃত, নিষিদ্ধ।

পারিভাষিক অর্থ:

مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْه الْإِلْزَام بِالتَّرْك.

'আবশ্যিকভাবে বর্জনের উদ্দেশ্যে শরী'আত প্রণেতা যা নিষেধ করেন, তাকে হারাম বলে।' যেমন: পিতা-মাতার অবাধ্যতা।

আমাদের বক্তব্য: ما نهى عنه الشارع (শরী'আত প্রণেতা যা নিষেধ করেন) একথা দ্বারা ওয়াজিব, মানদূব ও মুবাহ বুঝাবে না।

হারাম এমন বিষয়, যা আনুগত্যের ভিত্তিতে বর্জনকারী ছাওয়াব পাবে এবং পালনকারী শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। এটাকে মাহযূর (নিষিদ্ধ) ও মামনূ' (নিষিদ্ধ) বলা হয়।

ক্বাতঈ বা অকাট্য দলীলের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হলে 'হারাম' আর দলীলে যন্নীর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হলে 'মাকরূহ' গণ্য হবে।

৪. মাকরূহ (পালন নিন্দনীয়): মাকরূহ শব্দের আভিধানিক অর্থ: ঘৃণিত, নিন্দনীয়, অপছন্দনীয়। পরিভাষায়:

مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْه الْإِلْزَام بالتَّرْك.

'শরী'আত প্রণেতা সাধারণভাবে যা করতে নিষেধ করেন, আবশ্যিকভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য নয়, তাকে মাকরূহ বলে।' যেমন: বাম হাত দ্বারা লেন-দেন করা।

আমাদের বক্তব্য: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ (শরী'আত প্রণেতা যা নিষেধ করেন) একথা দ্বারা ওয়াজিব, মানদূব ও মুবাহ বুঝাবে না।

আমাদের বক্তব্য: لَا عَلَى وَجْه الْإِلْزَام بالتَّرْك (আবশ্যিকভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য নয়) একথা দ্বারা হারাম বুঝায় না। মাকরূহ কাজ আনুগত্যের ভিত্তিতে বর্জনকারী ছাওয়াব পাবে এবং তা পালনকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না।

৫. মুবাহ (পালন করা বৈধ): মুবাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘোষিত, অনুমোদিত।

পারিভাষিক অর্থ:

مَا لَا يَتَعَلَّقُ به أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لذَاته.

'যার মূল বিষয়ের সাথে কোন আদেশ বা নিষেধ থাকে না, তাকে মুবাহ বলে।' যেমন: রমাযানের রাতে খাবার খাওয়া।

আমাদের বক্তব্য: ما لا يتعلق به أمر (যার সাথে কোন আদেশ থাকে না) একথা দ্বারা ওয়াজিব ও মানদূব বুঝাবে না।

ولا نهي (এবং নিষেধও নয়) এ শব্দ দ্বারা হারাম ও মাকরূহ বুঝাবে না।

لذاته (মূল বিষয়ের সাথে) এ শব্দ দ্বারা এমন বিষয় আলাদা হয়েছে, যা কোন আদিষ্ট কাজের মাধ্যম অথবা যা কোন নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম। কেননা মুবাহ কোন আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ বিষয় যারই মাধ্যম হবে, তার হুকুমই গ্রহণ করবে।[১৩]

---

১৩. কোন মুবাহ কর্ম ওয়াজিব কর্মের মাধ্যম হলে মুবাহ কর্মটিও ওয়াজিব হবে। যেমন: পানি ক্রয় করার মূল হুকুম হচ্ছে মুবাহ; কিন্তু ছ্বলাত আদায়ের জন্য ওযু করা যদি এই পানি ক্রয়ের কারণ হয়, তবে ঐ পানি ক্রয় ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা যা ব্যতীত ওয়াজিব কাজ বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়, তাও ওয়াজিব। অনুরূপভাবে, আঙ্গুর বিক্রয় করা মুবাহ, কিন্তু যে মদ বানানোর জন্য আঙ্গুর কিনে, তার কাছে বিক্রয় করা হারাম।

এই পারিপার্শ্বিক বিষয় মুবাহকে তার মৌলিক হুকুম থেকে আলাদা করে দিবে না।[১৪]

মুবাহ বিষয়টি যতক্ষণ পর্যন্ত মুবাহ হিসাবে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর কোন ছওয়াব বা শাস্তি কোন কিছুই বর্তাবে না। এটিকে 'হালাল' বা 'জায়েয'নামেও নামকরণ করা হয়।

(খ) الأحكام الوضعية প্রতীকী বিধি-বিধান।

'প্রতীকী বিধি-বিধান'-এর পারিভাষিক অর্থ:

مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ لِثُبُوتٍ أَوِ انْتِفَاءٍ أَوْ نُفُوذٍ أَوْ إِلْغَاءٍ.

'যাকে শরী'আত প্রণেতা কোন কিছু সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়া অথবা কোন কিছু বাস্তবায়িত হওয়া বা না হওয়ার প্রতীক নির্ধারণ করেছেন, তাকে প্রতীকী বিধি-বিধান বলে। এর অন্যতম হলো: **الصحة** বা শুদ্ধ হওয়া এবং **الفساد** বা নষ্ট হওয়া।[১৫]

১। ছ্বহীহ (শুদ্ধ): 'ছ্বহীহ'-এর আভিধানিক অর্থ: রোগ থেকে মুক্ত বা নিরাপদ। পারিভাষিক অর্থ:

'যার কর্মের ফল ধার্য হয়, চাই সে কর্ম কোন ইবাদত হোক অথবা লেন-দেন বা চুক্তিমূলক হোক।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ছ্বহীহ হলো, যে কর্মের দ্বারা ব্যক্তি দায়িত্ব-মুক্ত হয়ে যায় এবং দাবী পূর্ণ হয়ে যায়।[১৬] লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে ছ্বহীহ হলো, যার ফলাফল

---

১৪. অর্থাৎ বিষয়টি মৌলিকভাবে বৈধই থেকে যাবে। যদিও সেটি কোন কোন ক্ষেত্রে আদিষ্ট বিষয়ের মাধ্যম হওয়ার কারণে আদিষ্ট অথবা নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ বিবেচিত হয়।

১৫. সাবাব বা কারণ, শর্ত, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতিও প্রতীকী বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

১৬. যখন কোন ব্যক্তির পালিত ফরয ইবাদত ছ্বহীহ হয়, তখন ঐ ব্যক্তি ফরযিয়্যাতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তার উপর থেকে কর্মটি পালনের দাবী পূর্ণ যায়। যেমন: কেউ যদি পাক-পবিত্র হয়ে উযূ অবস্থায় ক্বিবলামুখী হয়ে ছ্বলাত আদায় করে এবং ছালাতের সবকিছু ঠিকঠাক মত আদায় করে, তাহলে আমরা বলবো, তার ছ্বলাত ছ্বহীহ। কেননা, এর মাধ্যমে সে দায়িত্ব-মুক্ত হয়েছে এবং তার উপর অর্পিত দাবী পূর্ণ হয়েছে।

তার বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে ধার্য হয়। যেমন: ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে মালিকানা ধার্য হয়। কোন কর্মই তার শর্ত পূরণ ও প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া ছাড়া 'ছ্বহীহ' গণ্য হয় না।[১৭]

ইবাদতের ক্ষেত্রে ছ্বহীহ এর উদাহরণ হলো, ছ্বলাতের সমস্ত ওয়াজিব, রুকন ও শর্ত পূরণ করে যথাসময়ে তা আদায় করা। লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে এর উদাহরণ হলো, ক্রয়-বিক্রয়ে স্বীকৃত সমুদয় শর্ত পূরণ করে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা।

যদি কোন কর্মের মধ্যে কোন শর্ত না পাওয়া যায় অথবা কোন প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যায়, তবে কর্মটি ছ্বহীহ হিসাবে গণ্য হবে না। ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত না পাওয়ার উদাহরণ হলো, ওযু ছাড়াই ছ্বলাত আদায় করা।[১৮] লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে শর্ত না পাওয়ার উদাহরণ হলো, এমন জিনিস বিক্রয় করা, যার সে মালিক নয়।[১৯]

---

১৭. الشرط এর আভিধানিক অর্থ: আলামত, প্রতীক প্রভৃতি। পারিভাষিক অর্থ:

الشَّرطُ: ما يلْزَم من عَدَمه العدَمَ ولَا يلْزَم من وُجُوده الوجودَ.

"শর্ত বলা হয়, যার অবিদ্যমানতা শর্তযুক্ত জিনিসের অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে। তবে তার বিদ্যমানতা শর্তযুক্ত জিনিসের বিদ্যমানতাকে অবধারিত করে না।" যেমন; ছ্বলাতের জন্য ওযু করা শর্ত। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ওযু ছাড়াই ছ্বলাত আদায় করে, তাহলে তার ছ্বলাত ছ্বহীহ হবে না। কিন্তু ওযু করলেই যে ছ্বলাত যরূরী হয়ে যাবে, এমন নয়। কারণ অনেকেই ওযু করার পরও ছ্বলাত আদায় নাও করতে পারে।

السبب অর্থ: কারণ বা উপকরণ। পারিভাষিক অর্থ:

السَّبَب: ما يلْزَم من عَدَمه العدَمَ ويلْزَم من وُجُوده الوجودَ.

"অর্থাৎ যার অবিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট জিনিসেরঅবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে এবং যার বিদ্যমানতাসংশ্লিষ্ট জিনিসের বিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে।"

المانع এর আভিধানিক অর্থ: বাধাদানকারী, প্রতিবন্ধক। পারিভাষিক অর্থ:

المَانعُ: ما يلْزَم من وُجُوده العدَمَ ولَا يلْزَم من عَدَمه الوجودَ.

"যার বিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট জিনিসের অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে। তবে তার অবিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট জিনিসের বিদ্যমানতাকে অবধারিত করে না।" অর্থাৎ المانع ও الشرط সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

১৮. যেহেতু ছ্বলাত আদায় করার জন্য শর্ত হলো ওযু করা।

১৯. যেহেতু বিক্রয় ছ্বহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মালিক হওয়া।

ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার উদাহরণ হলো, নিষিদ্ধ সময়ে সাধারণ নফল ছ্বলাত আদায় করা। লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার উদাহরণ হলো, জুম'আর দ্বিতীয় আযানের পর জুমু'আ ফরয এমন ব্যক্তির অনুমোদিত পন্থায় ক্রয়-বিক্রয় করা (এ সময় বৈধ নয়)।[২০]

২. ফাসেদ বা নষ্ট: ফাসেদ-এর আভিধানিক অর্থ: ক্ষতিগ্রস্ত ও নষ্ট হয়ে যাওয়া। পারিভাষিক অর্থ:

ما لَا تترتَّب آثَار فعْله علَيْه عبادَةً كَانَ أَمْ عقْدا.

যার কর্মের ফল তার উপর বর্তায় না, চাই সেটা ইবাদত হোক অথবা লেন-দেন হোক।

সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে ফাসেদ হলো, যে কর্ম দ্বারা দায়িত্ব মুক্ত হয় না এবং দাবীও পূরণ হয় না। যেমন: সময়ের পূর্বেই ছ্বলাত আদায় করা। লেন-দেনের ক্ষেত্রে ফাসেদ হলো, যার কর্মের ফল তার উপর বর্তায় না। যেমন: অজ্ঞাত বস্তু বিক্রয় করা।[২১]

ইবাদত, লেন-দেন ও শর্তের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফাসেদ জিনিসই হারাম। কেননা, এটি আল্লাহ তা'আলার সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ভুক্ত এবং তার আয়াতকে উপহাসের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করার শামিল। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব লোকের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে নেই।[২২]

ফাসেদ ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য:

দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত ফাসেদ ও বাতিল একই অর্থে ব্যবহৃত হয়:

---

২০. সূরা জুমু'আ ৯ নং আয়াতে জুমু'আর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২১. যে কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রয়যোগ্য পণ্য জ্ঞাত বিষয় হতে হবে। সুতরাং অজ্ঞাত বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করলে, উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ গণ্য হবে।

২২. ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২১৫৫, মুসলিম হা/ ১৫০৪।

প্রথম ক্ষেত্র: হাজীদের ইহরামের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে উসূলবিদগণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, ফাসেদ হলো ঐ হাজ্জ যাতে মুহরিম ব্যক্তি প্রথম হালাল হওয়ার পূর্বে স্ত্রী মিলন করে।[২৩] আর বাতিল বলা হয় যার কারণে ব্যক্তি দীন ইসলাম হতে বেরিয়ে (মুরতাদ) হয়ে যায়।[২৪]

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: বিবাহ। এক্ষেত্রে উসূলবিদগণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, ঐ বিবাহকে ফাসেদ বলা হয়, যার ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। যেমন: মেয়ের অবিভাবক ছাড়া বিবাহ করা।[২৫]

পক্ষান্তরে ঐ বিবাহকে বাতিল বলা হয়, যার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ সবাই একমত। যেমন: ইদ্দত পালনকারী মহিলার ইদ্দত পালনরত অবস্থায় বিবাহ করা।[২৬]

---

২৩. ১০ যিলহাজ্জে কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন ও ত্বওয়াফে ইফাযাহ- এই তিনটি কাজের যে কোন দু'টি করলে একজন হাজী প্রথম হালাল বা ছোট হালাল হয়ে যায়। এই প্রথম হালাল হয়ে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রী মিলন করলে তার হাজ্জ ফাসেদ গণ্য হবে। কিন্তু তাকে অন্যান্য হাজীদের মতই হাজ্জের বাকী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবে তাকে এ হাজ্জের ক্বাযা আদায় করতে হবে।

২৪. মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মুরতাদ হয়ে গেলে তার হাজ্জ বাতিল গণ্য হবে। কাজেই সে ব্যক্তি পরক্ষণেই তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলে, তার জন্য জায়েয নেই হাজ্জের বাকী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। বরং তার জন্য আবশ্যক হলো পরবর্তীতে হাজ্জ পুনঃরায় আদায় করা।

২৫. কোন মেয়ে তার অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করলে অধিকাংশ ইমামদের মতে, উক্ত বিবাহ ফাসেদ বলে গণ্য হবে। তবে হানাফী মাযহাব মতে, মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানবান হলে, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করতে পারবে।

২৬. ইদ্দত বা শোক পালনকারী মহিলার ইদ্দতের সময়সীমা পূর্ণ না করা পর্যন্ত বিবাহ করা সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। দ্রঃ সূরা বাক্বারা ২:২৩৫।

العلم-ইলম

العلم - ইলম এর সংজ্ঞা:

العِلْمُ : إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى ما هو عَلَيْه إِدْرَاكًا جَازِمًا.

‘কোন জিনিসকে তার মূল স্বরূপের উপর দৃঢ়ভাবে জানা। যেমন: কোন জিনিসের অংশের চেয়ে পুরো জিনিসটা বড়, ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত প্রভৃতি।

আমাদের বক্তব্য: **إدراك الشيء** (কোন জিনিস সম্পর্কে জানা) এ অংশ দ্বারা কোন জিনিস সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে না জানা বিষয় বুঝাবে না। এটাকে جهل بسيط বা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বলা হয়। যেমন: কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, বদর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? আর সে জবাবে বলল, আমি জানি না।

আমাদের বক্তব্য: على ما هو عليه (তার মূল স্বরূপের উপর জানা) এ অংশ দ্বারা ইলম থেকে আলাদা হয়েছে এমন জিনিস, যা তার মূল স্বরূপ থেকে ভিন্নভাবে জানা হয়েছে। এটাকে جهل مركب বা মিশ্র অজ্ঞতা বলা হয়। যেমন: কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, বদর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? আর সে জবাবে বলল, হিজরী তৃতীয় সালে![২৭]

আমাদের বক্তব্য: إدراكا جازما (দৃঢ়ভাবে জানা) একথা দ্বারা দৃঢ়ভাবে না জানা বিষয় বুঝাবে না। এটা এভাবে যে, ব্যক্তি বিষয়টি যেভাবে জেনেছে, তা দৃঢ় নয়। তাছাড়া অন্য দিকটিও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং এভাবে জানাকে ইলম হিসাবে অভিহিত করা হবে না।

অতঃপর সম্ভাব্য দু'টি জিনিসের মাঝে একটি যদি তার নিকট অগ্রগণ্য বলে প্রতিভাত হয়, তাকে ظن বা প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান বলে। আর যার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হলো, তাকে وهم বা সংশয় বলে। পক্ষান্তরে যদি তার নিকটে উভয় জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে شك বা সন্দেহ বলে।

উক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হলো যে, কোন কিছু জানার সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কযুক্ত:

---

২৭. মিশ্র অজ্ঞতা হলো প্রথমত: সে জানে না কখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: সে যে বিষয়টি জানে না- এটাও সে বুঝতে পারে না!

১. العلم- এটি হলো কোন বিষয়কে তার মূল স্বরূপের উপর দৃঢ়ভাবে জানা।[২৮]

২. جهل بسيط -বা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা হলো, কোন বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে না জানা।

৩. جهل مركب- মিশ্র অজ্ঞতা, এটা হলো কোন জিনিসকে তার মূল স্বরূপ থেকে ভিন্নভাবে জানা।

৪. ظن-প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান হলো কোন বিষয়কে জানা, সাথে তার বিপরীত অগ্রগণ্য বিষয়টিও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

৫. وهم-সংশয় হলো কোন বিষয়কে জানা, সাথে তার বিপরীত অগ্রগণ্য জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

৬. شك বা সন্দেহ হলো, কোন জিনিসকে জানা, সাথে তার বিপরীত সমপর্যায়ের জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

العلم- ইলম এর প্রকারভেদ

ইলম দু'প্রকার। যথা:

১. العلم الضروري- বাধ্যগত ইলম

২. العلم النظري -চিন্তা-গবেষণা নির্ভর ইলম

১. العلم الضروري- বাধ্যগত ইলম:

যেখানে জ্ঞাত বিষয়ের ‘জানা’ বাধ্যগত হয়।[২৯] এটি এমনভাবে হয় যে, দলীল, চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই যা মানুষ জানতে বাধ্য হয়। যেমন: কোন কিছুর পূর্ণতা

২৮. অর্থাৎ কোন জিনিসকে দৃঢ়তার সাথে সঠিকভাবে জানা।

২৯. অর্থাৎ যা মানুষ বাধ্যগতভাবে জানে।

আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর, আগুন গরম, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল প্রভৃতি জানা।[৩০]

২.العلم النظري-চিন্তা-গবেষণা নির্ভর ইলম:

যে ইলম অর্জনে দলীল-প্রমাণ ও চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়, তাকে العلم النظري বা চিন্তা-গবেষণা মূলক ইলম বলে। যেমন: এটা জানা যে, ছ্বলাতের ক্ষেত্রে নিয়ত ফরয।

الكلام-বাক্য

আভিধানিকভাবে **الكلام** এর অর্থ হলো: অর্থবোধক উচ্চারিত শব্দ।[৩১]

পারিভাষিক অর্থ: **الكلام** এর অর্থ হলো:

اللَّفْظُ المُفِيدُ

'উপকারী বাক্যকে কালাম বা বাক্য বলা হয়।'[৩২]

যেমন: আল্লাহ আমাদের রব বা প্রতিপালক, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নাবী।

নূন্যতম যার দ্বারা বাক্য গঠিত হয় তা হলো, দু'টি ইসম বা বিশেষ্য দ্বারা অথবা একটি ইসম ও একটি ফে'ল দ্বারা। প্রথমটির উদাহরণ হলো مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

৩০. এ ধরনের ইলম জ্ঞানী, সাধারণ মানুষ সবাই জানতে পারে। এ ধরণের ইলম কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হবে। যেমন: আল্লাহ তা'আলার একত্ব, ছ্বলাতের ফরযিয়্যাত, সূদ, মদ, যেনা প্রভৃতি হারাম হওয়া ইত্যাদি।

৩১. আরবি ভাষায় বলা হয়- ما يتلفظ به الإنسان অর্থাৎ মানুষ যা উচ্চারণ করে। সুতরাং লাফয এর মধ্যে পাঁচটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত। তা হলো ১. ইসম বা বিশেষ্য ২. ফে'ল বা ক্রিয়া ৩. হরফ বা অব্যয় ৪. মুরাক্কাবে গাইরে মুফীদ বা অপরিপূর্ণ যৌগিক শব্দ ৫. মুরাক্কাবে মুফীদ বা বাক্য।

৩২. اللفظ المفيد দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুরাক্বাবে মুফীদ বা বাক্য। সুতরাং বোবা লোকের ইশারা, লেখা প্রভৃতি দ্বারা ভাব বোঝা গেলেও তা কালাম বা বাক্য নয়। যেহেতু এগুলি উচ্চারিত হয় না। অনুরূপভাবে যায়েদ, খালেদ প্রভৃতিও কালাম নয়, যেহেতু এগুলি দ্বারা পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না।

(মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল)। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো اسْتَقَامَ مُحَمَّدٌ (মুহাম্মাদ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

الكلام এর একটা অংশ হলো كَلِمة। পরিভাষায় كلمة বলা হয়-

اللَّفْظُ المَوضوعَ لمعْنًى مُفْرَد وَهيَ إمَّا اسْمٌ أَو فعْلٌ أَو حرفٌ.

'একক অর্থের জন্য গঠিত শব্দকেই كَلِمة বলা হয়।' এটি ইসম, ফেল বা হরফ হতে পারে।

সুতরাং كلمة বা শব্দ তিন প্রকার। যথা: ক. إسم বা বিশেষ্য খ. فعل বা ক্রিয়া গ. حرف বা অব্যয়।

ক. إسم বা বিশেষ্য

'যে শব্দ কোন সময় উল্লেখ না করে নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে, তাকে ইসম বলে। إسم তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: যা عموم বা ব্যাপকতার উপকারিতা দেয়।[৩৩] যেমন: الأَسْمَاء الموصولَةَ

দ্বিতীয় প্রকার: যা إطلاق বা শর্তহীনতার উপকারিতা দেয়। যেমন: হ্যাঁ-বাচকের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট ইসমের ব্যবহার।[৩৪]

তৃতীয় প্রকার: যা خصوص বা নির্দিষ্ট হওয়ার ফায়দা দেয়। যেমন: নির্দিষ্ট নামসমূহ।[৩৫]

---

৩৩. আম অর্থ ব্যাপক। এটি شمول عمومي বা ব্যাপকভাবে তার সকল একককে বুঝায়। যেমন: الإنسان দ্বারা ব্যাপকভাবে সব মানুষকে বুঝায়। যে কোন একজনকে বুঝায় না।

৩৪. মুতলাক্ব বা শর্তহীন। এটি কোনরূপ শর্ত ছাড়াই অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একজনকে নির্দেশ করে; সবাইকে উদ্দেশ্য করে না। যেমন: যদি বলা হয়: في الدار رجل (ঘরে একজন লোক রয়েছে)। এর দ্বারা অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একজন উদ্দেশ্য।

৩৫. আম, খাছ, মুতলাক্ব, মুক্বাইয়াদ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অচিরেই আসছে। তখন বিষয়টা স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

খ. فعل বা ক্রিয়া

'যে শব্দ নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করে এবং তার শব্দরূপের মাধ্যমে তিন কালের কোন এক কালকে নির্দেশ করে, তাকে ফে'ল বা ক্রিয়া বলে।[৩৬] এটি হয়তোবা ماضي বা অতীত কালের অর্থ প্রদান করবে। যেমন: فهم -সে বুঝেছে, অথবা مضارع বা বর্তমান/ভবিষ্যত কালের অর্থ প্রদান করবে। যেমন: يفهم সে বুঝছে বা বুঝবে, অথবা أمر বা নির্দেশের অর্থ প্রদান করবে। যেমন: افهم -তুমি অনুধাবন করো। সকলপ্রকার ফে'ল মুতলাক্ব বা শর্তহীনতার ফায়দা দেয়। সুতরাং এতেعموم বা ব্যাপকতা নেই।[৩৭]

গ. حرف বা অব্যয়

যা অন্য পদের সাথে মিলিত হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করে, তাকে হরফ বা অব্যয় বলে। হরফ বা অব্যয়ের অন্তর্ভুক্তপদ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. الواو এটি عاطفة (সংযোজক অব্যয়) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হুকুমের মধ্যে معطوفعليه ও معطوف কে শরীক হওয়ার ফায়দা দেয়।

---

৩৬. শব্দরূপ দ্বারা বিভিন্ন কাল প্রকাশ করে। যেমন: فَهِم - সে বুঝেছে, يفْهم সে বুঝছে বা বুঝবে, افْهم -তুমি বুঝো প্রভৃতি। তাই যেসব শব্দ রূপের পরিবর্তনের মাধ্যমে কাল না বুঝিয়ে মূল ধাতুর মাধ্যমে কাল নির্দেশ করে, সেগুলি ফে'ল হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন:نهار - দিন, ليلة রাত প্রভৃতি।

৩৭. যেমন: যদি বলা হয় صام يوم الإثنين- 'তিনি সোমবারে ছিয়াম রেখেছেন'। এর দ্বারা যে কোন এক সোমবারে ছিয়াম রাখা বুঝায়, সব সোমবারে ছিয়াম রাখা বুঝায় না। তবে ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ যদি ফে'লের সাথে যুক্ত হয়, তখন ফে'ল ব্যাপকতার উপকারিতা দিবে। যেমন: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإثنين. অর্থ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে ছিয়াম রাখতেন। এখানে ব্যাপকভাবে সব সোমবার উদ্দেশ্য। যে কোন এক সোমবার উদ্দেশ্য নয়। কেননা, كان শব্দটি অধিকাংশ সময় চলমান এর ফায়দা দেয়।

এটি দলীল ছাড়া তারতীব বা ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে না আবার তা নাকচও করে না।[৩৮]

২. الفاء -পদটিعاطفة (সংযোজক অব্যয়) হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং হুকুমের মধ্যে معطوف عليه ও معطوف কে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণের ফায়দা দেয়।[৩৯] এটি سببية (কারণ বর্ণনা করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩. اللام الجارة-'যের প্রদানকারী লাম'। এর বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, কারণ বর্ণনা করা, মালিকানা বুঝানো, বৈধতা বুঝানো প্রভৃতি।

৪. على الجارة-'যের প্রদানকারী على'পদটির বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, এ অব্যয় পদটি ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা দেয়।

أقسام الكلام - বাক্যের প্রকারভেদ:

সত্য বা মিথ্যা দ্বারা গুণান্বিত হওয়া বা না হওয়ার দিক দিয়ে বাক্য দু'প্রকার। যথা:

(১) خبر -বর্ণনামূলক বাক্য।

(২) إنشاء -অনুজ্ঞাসূচক বাক্য।

---

৩৮. ভিন্ন দলীল থাকলেও و পদটি তারতীবের ফায়দা দেয়। এর দলীল হলো আল্লাহ তা'আলঅ বলেন,

إِنَّ الصَّفَا والْمروةَ منْ شَعَائِر الله -'নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের অন্যতম'*(সূরা বাক্বারা ২:১৫৮)*। অত্র আয়াতটি ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে তারতীব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে সাঈ করাকে আবশ্যক করে না। কিন্তু হাদীছে আছে- أَبدَأُ بِمَا بدَأَ الله به -অর্থাৎ 'আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, আমি তা দ্বারা শুরু করছি'। সুতরাং অত্র হাদীছের ভিত্তিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক।

৩৯. ف পদটি ধারাবাহিকতা ও পর্যায়ক্রমের ফায়দা দেয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً

- 'তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তাআ'লা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। ফলে যমীন সবুজ হয়ে যায়'*(সূরা হাজ্জ ২২:৬৩)*।

(১) خبر-বর্ণনামূলক বাক্য:

ما يُمْكِنُ أَنْ يوصفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِه.

'যে বাক্যকে সত্ত্বাগতভাবে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত করা যায়, তাকে خبر (বর্ণনামূলক বাক্য) বলা হয়। আমাদের বক্তব্য:

ما يُمْكِنُ أَنْ يوصفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ

(যাকে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত করা যায়) এ অংশ দ্বারা إنشاء (অনুজ্ঞামূলক বাক্য) পৃথক হয়েছে। কারণ এটাকে সত্য বা মিথ্যা দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। কেননা, এর মর্মার্থ তার সম্পর্কে কোন সংবাদ নয় যে, যেখানে বলা যেতে পারে, 'সে সত্য বলেছে' অথবা 'সে মিথ্যা বলেছে'।

আমাদের বক্তব্য: لِذَاتِه (সত্ত্বাগতভাবে) এ শব্দ দ্বারা পৃথক হয়েছে এমন বর্ণনামূলক বাক্য, যাতে সংবাদদাতার বিবেচনায় সত্য বা মিথ্যার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সংবাদদাতার বিবেচনায় خبر (বর্ণনামূলক বাক্য) তিন প্রকার: যথা-

প্রথম: যাকে মিথ্যা দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রমাণিত হাদীছ।

দ্বিতীয়: যাকে সত্য দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। যেমন: শরী'আত বা বিবেক উভয় দিক থেকে অসম্ভব জিনিস সম্পর্কে খবর দেয়া। প্রথমটির (শরী'আতের দিক থেকে অসম্ভব) উদাহরণ হলো, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে নবুওয়াতের দাবিদার কর্তৃক শরী'আতের নতুন কোন সংবাদ দেয়া।[৪০]

দ্বিতীয়টির (বিবেকের দিক থেকে অসম্ভব) উদাহরণ হলো, পারস্পরিক বিপরীতধর্মী দু'টি জিনিস একীভূত হওয়ার খবর দেয়া। যেমন: একই সময়ে একই জিনিসের স্থির থাকা ও নড়া-চড়া করার খবর দেয়া।[৪১]

---

৪০. যেহেতু কুরআনে রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নাবী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, সেহেতু তার পরে কেউ নবুওয়াত দাবী করলে সে নিশ্চিতভাবে মিথ্যুক এবং তার প্রচারিত খবরও মিথ্যা *(দেখুন- সূরা আহযাব/৪০)*।

৪১. অর্থাৎ কোন বস্তু একই সময়ে নড়া চড়া করা আবার স্থির থাকা মানবীয় জ্ঞান বিচারে অযৌক্তিক বিষয়।

তৃতীয়ঃ যাকে সমভাবে বা একটিকে আরেকটির উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সত্য এবং মিথ্যা দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব। **যেমনঃ** কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে কোন ব্যক্তির খবর দেয়া প্রভৃতি।[৪২]

(২) إنشاء -অনুজ্ঞামূলক বাক্য:

مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الْكَذِبِ

'যাকে সত্য অথবা মিথ্যা দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়, তাকে إنشاء বা অনুজ্ঞামূলক বাক্য বলে। إنشاء বা অনুজ্ঞামূলক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হলো أمر (নির্দেশ), نهي (নিষেধ) প্রভৃতি। **যেমনঃ** আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

'তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না'*(সূরা আন-নিসা ৪:৩৬)*।

কখনও একই বাক্য দু'দিক বিবেচনা করে একই সাথে বর্ণনামূলক ও অনুজ্ঞামূলক হতে পারে। **যেমনঃ** লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চারণযোগ্য ছীগাহ বা শব্দরূপ। **যেমনঃ** بعت-আমি বিক্রয় করলাম, قَبِلْتُ - আমি গ্রহণ করলাম। উপরোক্ত বাক্যদ্বয় চুক্তিকারীর মনে যা রয়েছে, সেটা বুঝানোর দিকদিয়ে خبر বা বর্ণনামূলক আবার এতদুভয়ের উপর ভিত্তি করে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দিক দিয়ে এটি إنشاء বা অনুজ্ঞামূলক বাক্য।[৪৩]

---

৪২. যেমনঃ সততার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির সংবাদকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সত্য বলে জানবো আবার মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তির সংবাদকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মিথ্যা বলে জানবো। আর সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না, তার সংবাদ সত্য ও মিথ্যার ক্ষেত্রে সমসম্ভাবনা থাকবে।

৪৩. যেহেতু বাক্যদ্বয় বক্তার মনে যা আছে তার খবর দিচ্ছে, সে হিসাবে এটি বর্ণনামূলক। আবার এটি অনুজ্ঞামূলকও বটে, যেহেতু এর বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হিসাবে অভিহিত করা সম্ভব নয়।

কোন কোন সময় বাক্য خبر এর আকৃতিতে আসে কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয় إنشاء। আবার এর বিপরীতও হয়। অর্থাৎ বাক্য ব্যবহৃত হয় إنشاء এর আকৃতিতে কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয় خبر বা বিধেয় হিসাবে।

প্রথমটির (খবর দ্বারা ইনশা উদ্দেশ্য) এর উদাহরণ হলো নিম্নোক্ত আয়াত:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

'তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন পবিত্রতার সময়কাল অপেক্ষা করবে' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২২৮)*।

আয়াতে يتربصن (তারা অপেক্ষা করবে) এ শব্দটি خبر হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أمر (আদেশ)।[৪৪]

এর ফায়দা হলো, আদিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে এমনভাবে গুরুত্বারোপ করা, যেন কাজটি আদিষ্ট ব্যক্তির বিশেষণের ন্যায় এটি তার সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছে।[৪৫]

বিপরীতটির (অনুজ্ঞামূলক বাক্য দ্বারা বর্ণনামূলক বাক্য উদ্দেশ্য) উদাহরণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ

'যারা কুফরী করেছে, তারা ঈমানদার লোকদের বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো, (এতে পাপ হলে) আমরা তোমাদের পাপের ভার বহন করবো' *(সূরা আল-আনকাবূত ২৯:১২)*।

আয়াতে ولنحمل শব্দটি أمر এর আকৃতিতে আসলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো خبر অর্থাৎ আমরা বহন করবো।[৪৬] এর ফায়দা হলো, যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়, সেটিকে আবশ্যক ও অবধারিত জিনিসের স্থলে বসানো।

---

৪৪. আয়াতটির অর্থ হয়, তালাকপ্রাপ্তা নারীরা যেন তিন পবিত্রতার সময়কাল অপেক্ষা করে।

৪৫. خبر মূলতঃ ছিফাত বা বিশেষণ। যেমন: زيد قائم - যায়েদ দণ্ডায়মান। এখানে 'দণ্ডায়মান' হলো যায়েদ সম্পর্কে খবর, যা তার একটি বিশেষণ বুঝাচ্ছে। সুতরাং তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ব্যাপারে যখন ইদ্দত পালন করার খবর দেয়া হয়, সেটি যেন তাদেরই একটি ছিফাত বা বৈশিষ্ট্য, যা পালনের দাবীকে গুরুত্বারোপ করে।

ব্যবহারিক দিক থেকে كلام বা বাক্য দু'প্রকার:

(১) الحقيقة বা প্রকৃত অর্থবোধক।

(২) المجاز বা রূপক অর্থবোধক।[৪৭]

(১) الحقيقة প্রকৃত অর্থবোধক শব্দের পরিচয়:

فَالحَقِيقَةُ هِيَ اللَّفْظُ المستَعمل فِيمَا وَضِع لَه.

'শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, ঐ অর্থে তা ব্যবহৃত হওয়াকে হাক্বীকত বলে'।

আমাদের কথা: 'المستعمل (ব্যবহৃত অর্থবোধক শব্দ)' কথাটির দ্বারা مهملতথা অর্থহীন শব্দবাদ পড়েছে। তাই এ ধরনের শব্দকে হাক্বীকত বা মাজায কোনটিই

---

৪৬. অথচ আমর হিসেবে অর্থ হওয়ার কথা ছিল এরকম: 'আমরা যেন বহন করি।'

৪৭. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ তিন যুগ অর্থাৎ ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ যুগে কালামের এ বিভাজন প্রচলিত ছিল না। অথচ আরবী ভাষা সম্পর্কে পরবর্তীদের চেয়ে তারাই বেশি অবগত ছিলেন। ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, আবূ হানীফা, আওযাঈ, দাউদ (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ বিদ্বান ও তাদের শিষ্যদের লেখনীতে এর প্রমাণ মিলে। যারা মনে করে যে, প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ আলিম এবং অন্যান্য সালাফ ইমামগণ এ বিভাজন করেছেন, তাদের এ ধারণা সালাফ ইমামগণের বক্তব্যের ব্যাপারে অজ্ঞতা হিসাবে বিবেচিত হবে। যা মূলতঃ মু'তাযিলা ও তাদের অনুসারীদের বক্তব্য থেকে জানা যায়। আর তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, অভিধান এবং নাহু কোন বিষয়েই তাদের ভূমিকা বা অবদান নেই। আর ভাষা ও নাহু শাস্ত্রবিদ খলীল, সিবওয়াইহ, কিসাঈ, ফার্রা এবং তাদের মতো ভাষা ও ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে অন্যরাও এ বিভাজনের সাথে পরিচিত ছিলেন না *(দ্র: মাজমু'উ আল-ফাতাওয়া ২০/৪০০-৪০৫ পৃ)।* আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) এ বিভাজন বাতিল হওয়ার ৫০ টি দিক উল্লেখ করেছেন *(দেখুন, مختصر الصواعق المرسلة ২৭১ পৃ:)*। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শাইখ ছালিহ আল-উছাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

عَلَى كُلِ حَال نَحْن وضَعنَا فِي هَذَا الكِتَاب الحَقِيقَةَ والمَجاز، و هو من تَأْلِيفنَا لَكنْ إنَّمَا وضَعنَاه قَبل أَنْ يتبيَّنَ لَنَا الصِّحَّةُ، أَو يتبيَّن لَنَا بيانًا واضحًا أَنَّهُ لَا مَجاز..

'এ কিতাবে আমরা হাক্বীকত ও মাজায সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যা আমাদের রচনার অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ সঠিক বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া অথবা মাজায বলতে কিছুই নেই এটার সুস্পষ্ট বর্ণনার আগেই আমরা তা লিপিবদ্ধ করেছি' *(দেখুন, শারহুল উছুল মিন ইলমিল উছুল ১১৯ পৃ:)*।

গণ্য করা হবে না। فيما وضع له(যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে) এ অংশ দ্বারা মাজায বা রূপক অর্থবোধক শব্দ বাদ পড়েছে।

হাক্বীকত তিন প্রকার। যথা:

১. اللُّغَوِيَّةَ বা আভিধানিক হাক্বীকত।

২. الشَّرعِيَّةَ শারঈ হাক্বীকত।

৩.العرفِيَّةَ বা পারিভাষিক হাক্বীকত।

اللُّغَوِيَّةُ বা আভিধানিক হাক্বীকত-এর পরিচয়

هيالَّلفْظُالمُستَعمَلُفيماوضَعلَه فِي اللُّغَة.

'অভিধানে শব্দ যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, ঐ অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হওয়াকে اَلْحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ বা আভিধানিক হাক্বীকত বলে।

আমাদের কথা: 'فِي اللغة (অভিধানে)' সংজ্ঞার এ অংশ দ্বারা শারঈ ও পারিভাষিক হাক্বীকত বের হয়ে গেছে। الصلاة শব্দটি আভিধানিক হাক্বীকতের উদাহরণ। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দু'আ করা। অভিধানবিদদের বক্তব্য অনুযায়ী শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

اَلْحَقِيقَةُ الشَّرعِيَّةُ বা শারঈ হাক্বীকত

هِيَ اللَّفْظُ المستَعمَل فِيمَا وَضِع لَه فِي الشَّرعِ.

'শরী'আতে শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, ঐ অর্থে তা ব্যবহৃত হওয়াকে শারঈ হাক্বীকত বলে'। উক্ত সংজ্ঞায় 'فِي الشرع' অংশ দ্বারা আভিধানিক ও পারিভাষিক হাক্বীকত আলাদা হয়েছে। উদাহরণ: শরী'আতে الصلاة শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে,

هيَ الأَقْوالُ والأَفْعالُ المعلُومةُ المفْتَتحةُ بالتَّكْبيرِ المخْتَتَمةُ بالتَّسليم

‘ছ্বলাত হচ্ছে নির্দিষ্ট কথা ও কর্ম, যা আরম্ভ করা হয় তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার পাঠের মাধ্যমে আর শেষ হয় সালাম ফিরিয়ে’। সুতরাং শরী‘আত প্রণেতার উদ্দেশ্য অনুযায়ী শব্দটিকে উক্ত অর্থেই ব্যবহার করতে হবে।[৪৮]

العرفية বা পারিভাষিক হাক্বীকত

هيَ اللَّفْظُ المستَعمل فيمَا وَضع لَه في العرف.

‘পরিভাষায় শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, ঐ অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হওয়াকে পারিভাষিক হাক্বীকত বলে’।

সংজ্ঞায় ‘في العرف’ (পরিভাষায়) এ অংশ দ্বারা শারঈ ও আভিধানিক হাক্বীকত আলাদা হয়েছে। পারিভাষিক হাক্বীকতের উদাহরণ হচ্ছে, الدَّابَّة বা চতুষ্পদ প্রাণী। পরিভাষায় এ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো চার পা বিশিষ্ট প্রাণী। সুতরাং পরিভাষাবিদদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শব্দটি উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

হাক্বীকতের এ তিন প্রকার জেনে রাখার উপকারিতা হচ্ছে, ব্যবহৃত হওয়ার স্থানভেদে হাক্বীক্বী বা প্রকৃত অর্থের উপর শব্দ প্রয়োগ করা। তাই অভিধানবিদদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাক্বীকতে লুগাবিয়্যাহ বা আভিধানিক প্রকৃত অর্থে এবং শরী‘আতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হাক্বীকতে শারঈয়্যাহ তথা শারঈ প্রকৃত অর্থের উপরই শব্দ প্রয়োগ হবে। অনুরূপভাবে, পরিভাষায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিভাষাবিদদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রয়োগ হবে।

(২) المجاز মাজায বা রূপক অর্থ:

المجازَ هو اللَّفْظُ المستَعمل فِي غَيْرِ ما وضع لَه.

৪৮.কুরআন ও হাদীছে যখন ছ্বলাত শব্দ আসবে, তখন এর দ্বারা শারঈ ছ্বলাতই উদ্দেশ্য নেয়া হবে, যদি এ অর্থ উদ্দেশ্য নিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

'শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, ঐ অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে মাজায বলা হয়'। যেমনঃ বীরপুরুষ বুঝাতে أسد (সিংহ) শব্দের ব্যবহার। এখানে 'المستعمل (ব্যবহারিক অর্থবোধক)' এ অংশ দ্বারা مهمل তথা অর্থহীন শব্দ পৃথক হয়েছে। তাই অর্থহীন শব্দকে হাক্বীকত বা মাজায কোন কিছুই বলা হবে না।

আমাদের কথাঃ في غير ما وضع له (যে অর্থের জন্য শব্দ গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থ ছাড়া) এ অংশ দ্বারা হাক্বীকত বিলুপ্ত হয়েছে। হাক্বীক্বী বা প্রকৃত অর্থ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন সঠিক প্রমাণ ব্যতিরেকে মাজায বা রূপক অর্থে শব্দ প্রয়োগের বৈধতা নেই। এ দলীল-প্রমাণ ইলমুল বায়ান এর পরিভাষায় 'القرينة বা ইঙ্গিত' নামে পরিচিত।

মাজায বা রূপক অর্থে শব্দ ব্যবহার যথার্থ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, প্রকৃত ও রূপক অর্থের মাঝে যোগসূত্র বা বন্ধন বিদ্যমান থাকা। যাতে প্রকৃত অর্থকে রূপক অর্থ দ্বারা প্রকাশ করা যথাযথ হয়। এ বন্ধনকে ইলমুল বায়ান এর পরিভাষায় علاقة (সম্পর্ক) বলা হয়। এ সম্পর্ক হতে পারে مشابهة (পরস্পরিক সাদৃশ্য) বা অন্য কিছু। আর সম্পর্কে পারস্পরিক সাদৃশ্যতা বিদ্যমান থাকলে, তাকে استعارة বলে। যেমনঃ রূপক অর্থে বীর-পুরুষ বুঝাতে أسد (সিংহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর علاقة (সম্পর্ক) পারস্পরিক সাদৃশ্য ব্যতীত অন্য কিছু হলে, তাকে مجازمرسل বলে। আর কোন কিছুর দিকে মাজায বা রূপক অর্থকে إسناد সম্বন্ধযুক্ত করা হলে, তাকে مجازعقلي বলা হয়। مجازمرسل এর উদাহরণঃرعيناالمطر (আমরা ঘাসে চরিয়েছি)। এর হাক্বীক্বী বা প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আমরা বৃষ্টিতে চরিয়েছি। এখানে المطر (বৃষ্টি) শব্দটি العشب (ঘাস) এর রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই শব্দটি মাজায অর্থেই গণ্য।

مجازعقلي এর উদাহরণঃ أَنْبتَ الْمطَرَ العشّبَ (বৃষ্টি ঘাস উৎপন্ন করেছে)। এ বাক্যের প্রতিটি শব্দ হাক্বীক্বী বা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ঘাস উৎপন্ন হওয়ার সম্বন্ধ বৃষ্টির দিকে করা হয়েছে রূপক অর্থে। এখানে প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাই ঘাস উৎপন্নকারী। তাই المطر শব্দটি সম্বন্ধের দিক থেকে মাজায বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مجازمرسل এর আরো অন্তর্ভুক্ত বিষয়

হলো তা বৃদ্ধি পাওয়া ও বিলুপ্ত করণের মাধ্যমে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। উছূলবিদগণ নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করতঃ শব্দ বৃদ্ধির উদাহরণ দিয়েছেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

'কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়' *(সূরা শুরা ৪২:১১)*।

তারা বলেন, এখানে كَ কাফ বর্ণটি অতিরিক্ত। যা আল্লাহ তা'আলার সাদৃশ্যতা নাকোচ করার বিষয়টি গুরুত্বারোপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দ বিলুপ্তির উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ অর্থ: জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদকে *(সূরা ইউসূফ ১২:৮২)*। বাক্যেটি মূলে ছিল وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ। অর্থাৎ জনপদের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করুন।

উক্ত আয়াতাংশ হতে أهل (অধিবাসী) শব্দটিকে রূপকভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছে। মাজাযের আরো অনেক প্রকার রয়েছে, যা ইলমুল বায়ানে আলোচনা করা হয়েছে। উছূলে ফিক্বহের হাক্বীকত ও মাজায সম্পর্কে মাত্র একটি দিক আলোচনা করা হলো। কেননা, শব্দের প্রকৃত অথবা রূপক উভয় অর্থ ও হুকুম সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলাই এসম্পর্কে অধিক অবগত।

সতর্কীকরণ

কুরআন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কালাম বা বাক্যের হাক্বীকত ও মাজায অর্থের বিভাজন পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের নিকট প্রসিদ্ধ বিষয়। তবে বিদ্বানদের কেউ কেউ বলেছেন, কুরআনে কোন মাজায বা রূপক অর্থ নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কুরআনসহ অন্য কোথাও মাজায বা রূপক অর্থ বলতে কিছু নেই। আবূ ইসহাক্ব আল-ইসফারাইনী, পরবর্তীদের মাঝে আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানক্বীতি এ মন্তব্য করেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ও তার ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়্যিম বর্ণনা করেন যে, এ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ তিন যুগের পরে উদ্ভাবিত পরিভাষা। তিনি একথাটি শক্তিশালী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন। কেউ তা অবগত হলে তার নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, এটিই সঠিক মত।

الأمر। আমর বা নির্দেশ

الأمر। আমর এর সংজ্ঞা:

الأَمر قَولٌ يتَضَمَّن طَلَب الفعْلِ عَلَى سَبيلِ الاسْتعلَاء

'নির্দেশদাতা নিজেকে উর্দ্ধতন মনে করে কোন কাজ সম্পন্ন করার দাবীকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন বক্তব্যই হচ্ছে الأمر। (নির্দেশ)।

সংজ্ঞা বিশ্লেষণ:

আমাদের ভাষ্য: قول (বক্তব্য) শব্দটির মাধ্যমে ইশারা-ইঙ্গিতসূচক শব্দ আলাদা হয়েছে। তাই ইশারা দ্বারা কোন নির্দেশ করা হলেও তা أمر হিসাবে গণ্য হবে না। আর طلب الفعل (কোন কাজ সম্পন্ন করার দাবী) এ অংশ দ্বারা نهي নিষেধসূচক শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা نهي বা নিষেধসূচক শব্দের মাধ্যমে কাজ না করা দাবী পেশ করা হয়। আর الفعل (কোন কাজ সম্পন্ন করা) এ শব্দদ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাজটির অস্তিত্ব প্রদান করা। তাই 'আদিষ্ট কথা' এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সংজ্ঞায় على سبيل الاستعلاء (নিজেকে উর্দ্ধতন মনে করে) এ অংশটুকুর মাধ্যমে التماس (সহপাঠী ও সমবয়সীদের পারস্পরিক চাওয়া), দু'আ প্রভৃতি অর্থ যা أمر (নির্দেশসূচক) শব্দে 'ইঙ্গিতসূচক' শব্দের মাধ্যমে পাওয়া যায়, তা أمر হতে পৃথক হয়েছে।[৪৯]

صيغالأمر আমরের ছীগাহ বা শব্দরূপ।

أمر-এর শব্দরূপ চারটি। যেমন:

---

৪৯. বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীদের কাছে কোন জিনিস চাওয়া। যেমন: আমাকে একটি কলম দাও। দু'আর সময় চাওয়া। যেমন: হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো। যেহেতু এসব শব্দ ব্যবহার করতঃ বক্তা নিজেকে উর্দ্ধতন মনে করে না। তাই এসব أمر-এর ছীগায় চাওয়া অর্থ থাকলেও তা أمر হিসাবে গণ্য হবে না।

১. فعل الأمر বা নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

'তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব হতে, যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে' *(সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৪৫)*।

২. اسم فعل الأمر (ক্রিয়ার অর্থ জ্ঞাপক ইসম বা বিশেষ্য)। যেমন: حي على الصلاة 'ছ্বলাতের জন্য এসো'।

৩.المصدر النائب عن فعل الأمر (নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া পদের স্থলাভিষিক্ত মাছদার বা ক্রিয়ামূল)। যেমন:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

'যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা করো, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো' *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৪)*।

৪.المضارع المقرون بلام الأمر (নির্দেশ জ্ঞাপক লাম যুক্ত ফেলে মুদ্বারে বা ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া)। যেমন: **لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** 'যেন তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনো' *(সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৪)*।

কোন কোন সময় أمر-এর ছীগাহ ছাড়াও طلب الفعل বা ক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি পাওয়া যায়। যেমন: কোন কাজকে এরূপ বিশেষিত করা যে, এটা ফরয অথবা ওয়াজিব অথবা মানদূব অথবা তা আনুগত্য মূলক কাজ অথবা কোন কাজের কর্তাকে প্রশংসা করা অথবা কাজ বর্জনকারীকে নিন্দা করা অথবা কোন কাজের ছাওয়াব ধার্য হওয়া অথবা কোন কাজ পরিত্যাগকারীর শাস্তি ধার্য হওয়া।[৫০]

---

৫০. কোন বিষয়কে ফরয হিসাবে বিশেষিত করার উদাহরণ হলো: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

'তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করেছেন' *(ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯)*। ওয়াজিব এর উদাহরণ:

غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

ما تقتضيه صيغة الأمر নির্দেশ জ্ঞাপক ছীগাহ বা শব্দের চাহিদা: সাধারণত নির্দেশ জ্ঞাপক ছীগাহ আদিষ্ট বিষয় ওয়াজিব হওয়া এবং তা তৎক্ষণাৎ পালিত হওয়ার চাহিদা প্রকাশ করে। أمر এর ছীগাহ ওয়াজিব হওয়ার দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'জুমু'আর দিন গোসল করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব' *(ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৮২০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৪৬)*।

কোন কর্ম আনুগত্য হিসাবে বিশেষিত করার উদাহরণ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

من أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي

'যে কেউ আমার আমীরের আনুগত্য করলো, সে যেন আমারই আনুগত্য করলো'*(আবূ দাউদ হা/ ২৫৫৪)*।

কোন কর্মের কর্তাকে প্রশংসা করার উদাহরণ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

نِعْمَ الرَّجل عبدُ الله لَو كَانَ يقوم من اللَّيلِ

'আব্দুল্লাহ ইবনে উমার কতই না উত্তম লোক! যদি সে রাতে তাহাজ্জুদের ছ্বলাত আদায় করতো'*(বায়হাক্বী হা/১১২)*।

কোন কাজ বর্জন করার কারণে নিন্দা করার উদাহরণ হলো:

من تَرَكَ الرَّمي بعدَما عَلِمَهُ رغبَةً عنه فإنَّهَا نعمةٌ كَفَرَها

'তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করার পর যে অজ্ঞতাবশতঃ তা ছেড়ে দিলো, সে মূলতঃ একটি নিয়ামতের সাথে কুফরী করলো' *(জামে ছ্বহীহ লি-সুনান হা/৬১৪২)* ।

কোন কর্মের উপর ছাওয়াব ধার্য হওয়ার উদাহরণ হলো:

من صَلَّى عَلَيَّ صلاةً صَلَّى الله عَلَيْه بها عَشْرا

'যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার দয়া করেন' *(ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৮৪, আবূ দাউদ ৫২৩)*।

কোন কাজ বর্জন করার কারণে শাস্তি ধার্য হওয়ার উদাহরণ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوناً منْغيرعُذْرٍ طَبع الله عَلَى قَلْبه

'যে কেউ অবহেলা করে পরপর তিন জুমু'আ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন' *(আবূ দাউদ হা/১০৫২, নাসাঈ হা/১৩৫৯)*।

সুতরাং দেখা যায়, أمر-এর চার ছীগাহ ও আনুষঙ্গিকসহ মোট ১২ভাবে أمر হতে পারে।

'যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(সূরা আন-নূর ২৪:৬৩)*।

অত্র আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণের কারণ হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা ফিতনায় নিপতিত হবে। আর ফিতনা হলো সত্যপথ হতে বিচ্যুত হওয়া। অথবা তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। কেবল ওয়াজিব বর্জনের কারণে এরূপ হুশিয়ারী দেয়া হয়। তাই প্রমাণিত হয় যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ পালন ওয়াজিবের চাহিদা প্রকাশ করে।

أمر নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ পালনের চাহিদা প্রকাশ করে এ প্রসঙ্গে দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

'তোমরা সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১৪৮)*।

শারঈ নির্দেশিত সকল বিষয় কল্যাণকর। তাই কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে আরো দলীল হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার দিন কুরবানীর পশু যবেহ করা ও মাথা মুণ্ডন করার জন্য ছাহাবীদেরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তা পালনে ছাহাবীদের বিলম্ব করাকে তিনি অছন্দ করেন। এ কারণে যে কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন, তা উম্মে সালামার নিকট ব্যক্ত করেন। তাই বুঝা যায়, তাৎক্ষণিক আদেশ পালন অধিক সতর্কতা ও দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য অধিকতর সহায়ক। তাছাড়া বিলম্বে নির্দেশ পালনে অনেক সমস্যা রয়েছে। (উদাহরণ স্বরূপ তাৎক্ষণিক নির্দেশ পালন না করায়) অনেক ওয়াজিব বিষয় একত্রিত হয়, ফলে একপর্যায়ে তা পালনে ব্যক্তি অক্ষমতা প্রকাশ করে। أمر কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন দলীলের দাবির প্রেক্ষিতে ওয়াজিব ও তৎক্ষণাৎ পালনের চাহিদা থেকে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

১. أمر الندب (পালন করা বাঞ্ছনীয়) এমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

'তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখো' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২৮২)*।

পাস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার নির্দেশটি মানদূবের জন্য প্রযোজ্য। (ওয়াজিবের জন্য নয়)। দলীল হলো:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يُشْهِدْ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএক বেদূইন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। কিন্তু কোন সাক্ষী রাখেননি।[৫১]

২. الإطاحة বা বৈধতা অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পর أمر ব্যবহৃত হলে অধিকাংশ সময় তা পালন করা বৈধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথবা কোন বিষয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হলে এর জবাবে ব্যবহৃত أمر ও বৈধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিষেধাজ্ঞার পর أمر ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

'যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হবে, তখন শিকার করো' *(সূরা আল-মায়িদা ৫:২)*।

এখানে প্রাণী শিকার করার নির্দেশটি বৈধতা ঘোষণা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী থেকে প্রাপ্ত নিষেধাজ্ঞার পরএসেছে:

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

'ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হালাল মনে করো না' *(সূরা আল-মায়িদা ৫:১)*।

নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হলে এর জবাবে ব্যবহৃত أمر-এর উদাহরণ হলো, বিদায় হাজ্জের সময় ঈদের দিন পালনীয় কিছু কর্ম আগে-পরে পালন করা সম্পর্কে যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের জবাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেন, افعل،ولاحرج '(এখন) পালন করো কোন সমস্যা নেই'।[৫২]

৩. التهديد ধমক অর্থে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

---

৫১. আবূ দাউদ হা/৩৬০৭, নাসাঈ হা/৬২৪৩।

৫২. বুখারী হা/৮৩, মুসলিম হা/১৩০৬।

{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت: من الآية ٤٠]

‘তোমরা যা ইচ্ছা করো। নিশ্চয় তিনি দেখেন তোমরা যা করো *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১:৪০)*। তিনি আরো বলেন,

{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا} [الكهف: من الآية ٢٩]

‘আমি যালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি’ (সূরা আল-কাহাফ ১৮:২৯)।

উক্ত নির্দেশের পর শাস্তি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, নির্দেশটি ধমক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ পালন করা অর্থ ব্যতিরেকে বিলম্বে পালন করা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ: রমাদ্বানের ক্বাযা ছিয়াম পালন করা আদিষ্ট বিষয়। কিন্তু দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বুঝা যায়, তা তাৎক্ষণিক পালন করা আবশ্যক নয়; বরং বিলম্বে পালনীয়। যেমন: আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘আমার রমাদ্বান মাসের ছিয়াম অবশিষ্ট থেকে যেতো। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমাতে ব্যস্ত থাকার কারণে শা‘বান মাস ছাড়া অন্য সময়ে আমি তা আদায় করার সুযোগ পেতাম না’।[৫৩]

যদি নির্দেশটি বিলম্বে পালন করা হারাম হতো, তাহলে আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা কে তা বিলম্বে পালন করার উপর বহাল থাকতে দেয়া হতো না।

ما لا يتم المأمور إلا به

‘যা ছাড়া নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন হয় না’।

নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করার বিষয়টি কোন জিনিসের উপর নির্ভর করলে তখন ঐ জিনিসটিও নির্দেশিত হিসাবে গণ্য হয়। তাই নির্দেশিত বিষয়টি ওয়াজিব হলে ঐ জিনিসটিও ওয়াজিব হয়ে যায়, কাজটি মানদূব (বাঞ্ছনীয়) হলে ঐ জিনিসও মানদূব (বাঞ্ছনীয়) হয়ে যায়।

---

৫৩. ছ্বহীহ বুখারী ১৯৫০, ছ্বহীহ মুসলিম ১১৪৬।

ওয়াজিবের উদাহরণ: গুপ্তাঙ্গ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। যেহেতু গুপ্তাঙ্গ ঢেকে রাখা কাপড় ক্রয় করার উপর নির্ভর করে, তাই কাপড় ক্রয় করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

মানদূবের উদাহরণ: জু'আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা মানদূব (বাঞ্ছনীয়)। যেহেতু সুগন্ধি দেয়া তা ক্রয় করার উপর নির্ভর করে, তাই সুগন্ধি ক্রয় করা মানদূব (বাঞ্ছনীয়) হিসাবে গণ্য। এ নিয়মটি একটি ব্যাপক মূলনীতির অন্তর্গত। আর তা হলো,

الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ، فَوَسَائِلُ المَأْمُورَاتِ مَأْمُورٌ بِهَا، وَوَسَائِلُ المَنْهِيَّاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا.

'কোন বিষয়ে মূল উদ্দেশ্যের হুকুম তার উপকরণের হুকুম হিসাবে গণ্য হবে। তাই আদিষ্ট বিষয়ের উপকরণ আদিষ্ট বলেই গণ্য এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের উপকরণ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

النَّهْيُ-নিষেধ

النَّهْيُ-নিষেধ এর পরিচিতি:

قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ هِيَ المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَا النَّاهِيَةُ

'النَّهي (নিষেধ) হলো এমন বক্তব্য, যা নিষেধসূচক لا অব্যয়যুক্ত المضارع এর নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে উর্দ্ধতন মনে করে কোন কাজ সম্পন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখা বুঝায়'।

النَّهْيُ এর উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ} [الأنعام: من الآية ١٥٠]

'তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশনাবলীকে মিথ্যা মনে করে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না'*(সূরা আল-আন'আম ৬:১৫০)*।

আমাদের ভাষ্য: قول (বক্তব্য) দ্বারা ইঙ্গিতসূচক শব্দ আলাদা হয়েছে। তাই ইঙ্গিতসূচক শব্দ 'নিষেধ' এর অর্থ প্রদান করলেও তা النَّهي হিসাবে গণ্য হবে

না। طلب الكف (বিরত থাকার দাবি) এ অংশ দ্বারা أمر বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ 'আমর' কোন কাজ সম্পন্ন করার দাবি নির্দেশ করে। على وجه الاستعلاء (নিজেকে উর্দ্ধতন মনে করা) এ অংশ দ্বারা অনুরোধ, দু'আ করা ইত্যাদি আলাদা হয়েছে, যা 'ক্বারীনা' বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে النَّهي থেকে পাওয়া যায়।

بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية (নিষেধসূচক لا অব্যয়যুক্ত المضارع এর নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে) এ অংশ দ্বারা ঐসব বিষয় বিলুপ্ত হয়েছে, যা 'আমর'-এর ছীগার মাধ্যমে কোন কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি পেশ করা হয়। যেমন: دع-তুমি ছেড়ে দাও। اُتْرُكْ -তুমি বর্জন করো। كُفَّ-তুমি বিরত থাকো ইত্যাদি। এসব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি করা হলেও তা নির্দেশজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে হয়ে থাকে, সে কারণে نهي নয়; বরং তা أمر হিসাবে গণ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে نهي এর ছীগাহ ছাড়াও অন্যান্য শব্দের মধ্যে طلب الكف (বিরত থাকার দাবি) নিহিত আছে। যেমন: কোন কাজকে হারাম, নিষিদ্ধ, মন্দ প্রভৃতি গুণে বিশেষিত করা অথবা কোন কাজের কর্তাকে নিন্দা করা অথবা কোন মন্দ কাজ করলে শাস্তি আরোপ করা ইত্যাদি।[৫৪]

---

৫৪. কোন কাজ হারাম হিসাবে আখ্যায়িত করার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَأَحلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وحَرَّمَ الرِبا

'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম' (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৭৫)।

কোন কর্মকে মন্দ হিসেবে আখ্যায়িত করার উদাহরণ হলো: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ

" কুকুর বিক্রিত মূল্য নিকৃষ্ট।"

কোন কর্মের কারণে শাস্তি বর্ণিত হওয়ার উদাহরণ হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)

'যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে' *(সূরা আন নিসা /১০)*।

ما تقتضيه صيغة النهي

আন নাহী এর ছীগা শব্দের মাধ্যমে যে দাবি পেশ করা হয়

النهي এর ছীগার মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিষয় হারাম এবং কোন কিছু অন্যায় হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবি পেশ করা হয়। এ ছীগা ব্যবহৃত হওয়ার মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত করণের উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوهَ وما نَهَاكُم عنهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: من الآية ٧

'রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো' (*সূরা আল-হাশর ৫৯:৭*)।

অতএব, তিনি যা কিছু নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। সর্বোপরি নিষিদ্ধ কর্মটি হারাম হওয়াই উদ্দেশ্যে।

নিষিদ্ধ কর্ম অন্যায় গণ্য হওয়ার উদাহরণ: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

من عَمِلَ عَمَلاً لَيس عَلَيْه أَمرنَا فَهَو ردٌّ

'যে কেউ এমন কোন কাজ করলো যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৫৫] বুঝা গেলো, যা কিছু তিনি নিষেধ করেছেন, তা ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ নয়। অতএব, তা প্রত্যাখ্যাত।

'নিষিদ্ধ বিষয়' কি বাতিল হবে নাকি হারাম হওয়া সত্ত্বেও ছ্বহীহ হবে? এ ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(১) নিষেধাজ্ঞা নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বা বা শর্তের দিকে ফিরে গেলে নিষিদ্ধ বিষয়টি বাতিল গণ্য হবে।

(২) নিষেধাজ্ঞা বহিরাগত কোন বিষয়ের দিকে ফিরে যাবে, যা নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বা বা শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এমতাবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়টি বাতিল গণ্য হবে না।

ইবাদতের ক্ষেত্রে 'নিষেধাজ্ঞা' নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বার দিকে ফিরে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: দু'ঈদের দিন সিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞা।

---

৫৫. ছ্বহীহ মুসলিম ১৭১৮।

পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে 'নিষেধাজ্ঞা' নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বার দিকে ফিরে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: যার উপর জুম'আর ছ্বলাত ফরয এমন ব্যক্তিকে জুম'আর দিন দ্বিতীয় আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা।

ইবাদতের ক্ষেত্রে 'নিষেধাজ্ঞা' নিষিদ্ধ বিষয়ের শর্তের দিকে ফিরে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: পুরুষকে রেশমের কাপড় পরিধান করার নিষেধাজ্ঞা। ছ্বলাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা। সুতরাং কেউ যখন নিষিদ্ধ কাপড় পরিধান করে লজ্জাস্থান ঢাকবে, নিষেধাজ্ঞা ছ্বলাতের শর্তের দিকে ফিরে যাওয়ার কারণে ছ্বলাত শুদ্ধ হবে না।[৫৬]

পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে 'নিষেধাজ্ঞা' নিষিদ্ধ বিষয়ের শর্তের দিকে ফিরে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: গর্ভস্থিত প্রাণী ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা। যেহেতু বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রয়যোগ্য পণ্য সম্পর্কে জানা। কাজেই কেউ যখন গর্ভস্থিত প্রাণী বিক্রয় করবে, নিষেধাজ্ঞা শর্তের দিকে ফিরে যাওয়ার কারণে বিক্রয়টি শুদ্ধ হবে না।

ইবাদতের ক্ষেত্রে 'নিষেধাজ্ঞা' বহিরাগত কোন বিষয়ের দিকে ফিরে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: পুরুষকে রেশমের পাগড়ী পরিধান করার নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং কেউ যদি রেশমের কাপড় পরিধান করে ছ্বলাত আদায় করে, তাহলে তার ছ্বলাত বাতিল হবে না। কেননা, এখানে নিষেধাজ্ঞা ছ্বলাতের সত্ত্বা বা শর্তের দিকে ফিরে যায়নি।

পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে 'নিষেধাজ্ঞা' বহিরাগত কোন বিষয়ের দিকে ফিরে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো: ধোঁকা দেয়ার নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ধোঁকা দিয়ে কোন কিছু বিক্রয় করে, তাহলে তার বিক্রয়টি বাতিল হবে না। কারণ নিষেধাজ্ঞাটি ক্রয়-বিক্রয়ের সত্ত্বা বা শর্তের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়নি।

ভিন্ন দলীলের দাবির কারণে نَهي বা নিষেধাজ্ঞা 'হারাম সাব্যস্ত' করার অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

---

৫৬. কিছু বিদ্বান বলেছেন, হারাম পোশাক পরিধান করে ছ্বলাত আদায় করলে তার ছ্বলাত হয়ে যাবে। তবে হারাম পোশাক পরিধান করার কারণে সে গোনাহগার হবে। তারা আরো বলেছেন, এতে মূলত নিষেধাজ্ঞাটি শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ শর্ত হলো, লজ্জাস্থান ঢাকা। যেহেতু ছ্বলাত আদায়কারী লজ্জাস্থান ঢেকেছে, কাজেই তার ছ্বলাত শুদ্ধ হবে। যদি সরাসরি রেশমের কাপড় পরে ছ্বলাত আদায় করতে নিষেধ করা হতো, তবে নিষেধাজ্ঞাটি শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হত *(দেখুন: শরহুল মুমতি' ২/১৫১, আল ইখতিয়ারাত /৪১)*।

(১) الكراهة- মাকরূহ: উসূলবিদগণ এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে। তিনি বলেছেন,

لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيمينه وهو يبولُ

'তোমাদের কেউ যেন পেশাব করা অবস্থায় তার পুরুষাঙ্গ না ধরে'।[৫৭]

অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, এখানকার নিষেধাজ্ঞা 'মাকরূহ'-এর জন্য প্রযোজ্য। কেননা, লজ্জাস্থান মানুষেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। এখানে নিষেধ করার তাৎপর্য হলো, ডান হাতকে তা হতে বিরত রাখা।

(২) الإرشاد - নির্দেশনা দেওয়ার জন্য: যেমন: মুআ'য রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دبر كُلِ صلَاة: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وحسنِ عِبَادَتِكَ

'প্রত্যেক ছ্বলাতের পর এ দু'আ বলা অবশ্যই ছেড়ে দিবে না: হে আল্লাহ, আমাকে তোমার যিকর, তোমার শুকরিয়া ও ভালো ইবাদত করতে সহযোগিতা করো'।[৫৮]

من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي

আমর ও নাহী দ্বারা সম্বোধনে কারা অন্তর্ভুক্ত হবে?

الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هوالمكلف، وهو البالغ العاقل.

আমর ও নাহী দ্বারা সম্বোধনের মধ্যে মুকাল্লাফ তথা শরী'আতের দায়িত্ব বর্তায় এমন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে। আর মুকাল্লাফ হচ্ছে: প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেকবান ব্যক্তি।

আমাদের ভাষ্য: البالغ আল বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) শব্দটি দ্বারা শিশু আলাদা হয়েছে। তাই শিশু আদেশ-নিষেধের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দায়িত্বপ্রাপ্তির সমান হবে না। তবে ভালো-মন্দ পার্থক্য করার বয়সে উপনীত হওয়ার পর আনুগত্যমূলক কাজের প্রশিক্ষণ হিসাবে তাকে ইবাদত পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে এবং সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে তাকে বাধা দেওয়া হবে, যাতে তার অন্যায় থেকে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

---

৫৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭।

৫৮.ছ্বহীহ: সুনানে আবূ দাউদ হা/১৫২২, মুসনাদে আহমাদ।

আমাদের বক্তব্য: العاقل **আল 'আক্বিল** (জ্ঞানবান) দ্বারা মস্তিস্ক বিকৃত হয়েছে এমন ব্যক্তি বুঝায় না। সুতরাং পাগল আদেশ-নিষেধের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে না। তবে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করা থেকে এবং ধ্বংসাত্মক কাজ হতে তাকে বাধা দেওয়া হবে। যদি সে কোন আদিষ্ট বিষয় পালন করে, তাহলে তাতে আনুগত্যের উদ্দেশ্য না থাকার কারণে শুদ্ধ হবে না।

তবে শিশু ও পাগলের সম্পদে যাকাত ফরয হওয়া ও 'অর্থনৈতিক অধিকার' উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ এগুলির আবশ্যকতা সুনির্দিষ্ট কিছু কারণের সাথে যুক্ত। যখনই সেই কারণগুলি পাওয়া যাবে, তখনই হুকুম সাব্যস্ত হবে। এতএব এগুলিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো 'কারণ'; 'ব্যক্তি' নয়।

আদেশ নিষেধের দায়িত্ব মুসলিম, কাফির সবার উপর বর্তায়। কিন্তু কাফির ব্যক্তির জন্য কুফরী অবস্থায় আদিষ্ট বিষয় পালন করা শুদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: من الآية ٥٤].

'তাদের অর্থ সাহায্যে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রসূলকে অস্বীকার করে' *(সূরা আত-তাওবাহ ৯:৫৩)*।

তবে কাফের অবস্থায় ছুটে যাওয়া আমল মুসলিম হওয়ার পর কাযা করারও নির্দেশ দেওয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

'তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও, তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে, তা ক্ষমা করা হবে' *(সূরা আল-আনফাল ৮:৩৮)*।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمرو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

'হে আমর, তুমি কি জানো না, নিশ্চয় ইসলাম পূর্বের সমস্ত গোনাহকে মিটিয়ে দেয়'।[৫৯] আর কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শরী'আত নির্দেশিত বিষয় পালন করা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

---

৫৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১

ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাদের জবাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} {حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ}

‘জান্নাতীরা বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা ছ্বলাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। আমাদের নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত’ *(সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির ৭৪: ৪৩-৪৭)*।

موانع التكليف -শরী‘আতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

কারো উপর শরী‘আতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো: অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, বাধ্য করা প্রভৃতি।[৬০]

---

৬০. কারো উপর শরী‘আতের দায়িত্ব আরোপিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো: অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, বাধ্য করা প্রভৃতি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

নিশ্চয় আল্লাহ তা‘য়ালা আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি ও বলপূর্বক যা করিয়ে নেওয়া হয়, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ (ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩, বাইহাক্বী ৬/৮৪, হাফেয ইবনু কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) তার ‘তুহফাতুত ত্বলিব’ (১/২৭১/১৫৮) নামক গ্রন্থে হাদীছটির সনদ উত্তম বলেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: ছ্বহীহুল জামে‘ হা/১৭৩১।)

(ক) الجهل: হলো না জানা, অজ্ঞতা। জ্ঞাত বিষয়ের বিপরীত কর্ম সম্পন্ন করা অজ্ঞতা।

কতিপয় উছুলবিদ বলেন, কোন জিনিস সম্পর্কে না জানাই অজ্ঞতা। কতিপয় আলিম বলেন, প্রথম অবস্থাকে বলা হয় جهل مركّب বা মিশ্র অজ্ঞতা। আর দ্বিতীয় পর্যায় হলো جهل بسيط বা ব্যাপকতর অজ্ঞতা। মুকাল্লাফ (শরী‘আতের দায়িত্বশীল ব্যক্তি) যখন কোন বিষয়ের হারাম হওয়া সম্পর্কে না জেনে হারাম কাজটি করে অথবা না জেনে কোন ওয়াজীব ছেড়ে দেয় তাহলে তার উপর কোন পাপ বর্তাবে না। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি ও বলপূর্বক যা করিয়ে নেওয়া হয়, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন'।[৬১]

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দেই না (*সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:১৫*)।

(খ) النسيان : ভুলে যাওয়া। النسيان হলো কোন জ্ঞাত বিষয় অন্তরে স্বরণ করতে না পারা। এর উদাহরণ হলো কোন জিনিস ভুলে যাওয়া। তাই যে ভুল বশতঃ ওয়াজীব ছেড়ে দেয় অথবা ভুল করে হারামে লিপ্ত হয় তাহলে তার উপর শাস্তি ধার্য হবে না। তবে ওয়াজীব ছেড়ে দেয়ায় তার দায়িত্ব মুক্তি হবে না। যখনই স্বরণ হবে তা আদায় করে নিবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»

'যে ব্যক্তি কোন ছ্বলাত আদায় করতে ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ে নেয়।' ছ্বহীহ বুখারী /৫৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম /৬৮৪।

(গ) الخطأ: খাত্বা হলো কোন কর্ম সম্পন্ন করার নিয়ত করা অতঃপর যা নিয়ত করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে আকস্মিকভাবে অন্যকর্ম সম্পন্ন করা। কেউ কোন কর্ম সম্পন্ন করলে ঐ কর্মে ভুল হলে তার উপর পাপ বর্তাবে না। কেননা, এ ধরণের ভুল উদ্দেশ্য ও নিয়তের উপর ধার্য। আর এ ভুলে অমনোযোগী ও ভুলকারীর (অন্যায়ের কর্মের) উদ্দেশ্য নেই। কাজেই তাদের উপর পাপ বর্তাবে না।

(ঘ) الإكراه: ইকরাহ হলো কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা, যা সে আদৌ করতে ইচ্ছুক নয় অথবা যা সে করতে চায় তা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা। তাই কোন ব্যক্তিকে কোন হারাম কাজ করা অথবা কোন ওয়াজীব ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হলে তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে না। পারিবারিকভাবে যারা স্ব-অবস্থানে রয়েছে তারা দায়িত্বশীল।

বিধান পালন না করার যথার্থ কোন কারণ দেখা দিলে ঐ সময় তারা অপারগ হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদেরকে ক্ষমা করা হবে । ঐ কারণ না থাকলে ওয়াজীব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত হবে। কেননা, ওয়াজীব পালনের দায়িত্ব শেষ হয় না। মোদ্দাকথা, উক্ত চারটি কারণে কোন কিছু করতে বাধ্য হলে তাতে পাপ বর্তাবে না। কেননা, উদ্দেশ্যের ধরণ অনুযায়ী পাপ বর্তায়। আর এসব বাধ্যগত কারণে যা কিছু করা হয় তাতে অসৎ উদ্দেশ্যে নেই।

৬১. ইবনু মাজাহ /২০৪৩, বায়হাক্বী ৬/৮৪, আজালূনী তার 'কাশফুল খাফা' (১/৫২৩/১৩৯৩) নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থ 'আর রওযা' ও 'আল-আরবাঈন' নামক গ্রন্থে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।'

হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী। হাদীছটির বিশুদ্ধতা প্রমাণে কুরআন ও হাদীছে আরো অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

جهل বা অজ্ঞতা: جهل হলো না জানা। সুতরাং মুকাল্লাফ ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের হারাম হওয়া সম্পর্কে না জেনে হারাম কাজটি করে ফেলে, তখন তার উপর কোন শাস্তি ধার্য হয় না। যেমনঃ কোন ব্যক্তি ছ্বলাতে কথা বলা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি না জেনে কথা বললো। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি ওয়াজিব কর্ম ছেড়ে দেয়, তার ওয়াজিব সম্পর্কে না জানার কারণে, তবে উক্ত ওয়াজিব কর্ম পালন করার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে থাকলে ঐ ব্যক্তিকে তা ক্বাযা আদায় করতে হবে না। দলীলঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে অতীতের ছ্বলাত ক্বাযা করার নির্দেশ দেননি। বরং তাকে শুধু বর্তমান ছ্বলাত শারঈ পন্থায় সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

النسيان বা ভুলে যাওয়া: النسيان হলো কোন জ্ঞাত বিষয় অন্তরে স্মরণ করতে না পারা।[৬২] এতএব কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ কোন কাজ করলে, তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে না। যেমনঃ কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ ছিয়াম অবস্থায় কিছু খেয়ে নিলো। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কোন ওয়াজিব কাজ ভুলবশতঃ ছেড়ে দিলো, তাহলে ভুল অবস্থায় তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। তবে তা স্মরণ হওয়া মাত্র তাকে তা আদায় করতে হবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَن نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

'যে ব্যক্তি কোন ছ্বলাত আদায় করতে ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ে নেয়'।[৬৩]

হাফেয ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ তার 'তুহফাতুত ত্বলিব' (১/২৭১/১৫৮) নামক গ্রন্থে হাদীছটির সনদ উত্তম বলেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন (দেখুনঃ ছ্বহীহুল জামে' হা/১৭৩১)।

৬২. অন্তরের বেখেয়াল হয়ে যাওয়া- এভাবে বললে এর অর্থ দাঁড়ায় মানুষের স্মৃতি অন্তরে থাকে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানে এটা প্রমাণিত যে, মানুষের স্মৃতি থাকে মস্তিষ্কে। অন্তরের কাজ হলো বুঝা, উপলব্ধি করা, ভালো মন্দ নিরূপণ করা প্রভৃতি। আর মস্তিষ্কের কাজ হলো তা সংরক্ষণ করা। কাজেই نسيان এর সংজ্ঞা এভাবে দিলে আর কোন আপত্তি থাকে না।

نسيان হলো কোন জ্ঞাত বা জানা জিনিস ভুলে যাওয়া'।

৬৩. ছ্বহীহ বুখারী /৫৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম /৬৮৪।

الإكراه: إكراه হলো কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা, যা সে আদৌ করতে চায় না। এতএব কোন ব্যক্তিকে কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করা হলে তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে না। যেমনঃ কোন ব্যক্তিকে যদি কুফরী করতে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানের সাথেই প্রশান্ত আছে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে যদি ওয়াজিব কাজ পালন না করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে বাধ্যগত অবস্থায় তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে না। তবে বাধ্যগত অবস্থা দূর হয়ে গেলে তাকে তা ক্বাযা করতে হবে। যেমনঃ কোন ব্যক্তিকে ছ্বলাত আদায় না করতে বাধ্য করা হলো, এমনকি তা আদায়ের সময় চলে গেলো, তাহলে তার এই বাধ্যগত অবস্থা দূর হয়ে গেলে তাকে উক্ত ছ্বলাত ক্বাযা করতে হবে।

উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ কেবল আল্লাহ তা'আলার হক্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, এসব কারণ ক্ষমা ও দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব সৃষ্টি জীবের হক্বের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব আদায় করা আবশ্যক, সেক্ষেত্রে হক্বদার ব্যক্তি তার দাবি ছেড়ে দিতে সম্মত না হলে, উক্ত বিষয়সমূহ প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য হবে না।[৬৪] আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

العام আল 'আম বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ

العام আল 'আম এর সংজ্ঞা: العام এর আভিধানিক অর্থ অন্তর্ভুক্তকারী। عام 'আম এর পারিভাষিক অর্থ:

اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ

'عام হলো এমন শব্দ, যা কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তার সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে'। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

'পুণ্যবান লোকেরা থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে' (*সূরা আল-ইনফিতার ৮২:১৩*)।

---

৬৪. যেমনঃ কোন ব্যক্তি অন্যের কাপড় নিজের মনে করে পরিধান করলো। অতঃপর দেখলো যে, কাপড়টি পুরাতন হয়ে গেছে, ফলে কাপড়টি ছিঁড়ে ফেললো। অন্যের কাপড় জানার পর কাপড়ওয়ালা দাবি না ছাড়লে তাকে উক্ত কাপড়ের জরিমানা দিতে হবে।

আমাদের ভাষ্য: المستغرق لجميع أفراده (যা তার সমস্ত একককে শামিল করে)। এ অংশ দ্বারা ঐ সকল জিনিস থেকে আলাদা হয়েছে, যা কেবল একটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: নির্দিষ্ট নাম, যা কেবল একটি একককে অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে হ্যাঁ-বাচক অর্থের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যও শুধুমাত্র একজনকে বুঝায়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

'একটি দাস মুক্ত করতে হবে' *(সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৩)*।

উক্ত আয়াতাংশ ব্যাপকভাবে সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একজনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

بلا حصر (সীমাহীন) এ অংশ দ্বারা ঐসব জিনিস থেকে আলাদা হয়েছে, যা সীমাবদ্ধতার সাথে তার সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: সংখ্যাবাচক বিশেষ্য একশ, এক হাজার ইত্যাদি।

صيغ العموم ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী:

عام এর শব্দরূপ ৭ টি। যথা:

(১) মৌলিকভাবে শব্দ ব্যাপক অর্থের প্রমাণ বহন করে। যেমন:

كل وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛

كل-সব/ সবাই, جميع-সবাই, كافة-সকল, قاطبة-সমস্ত, عامة-ব্যাপক।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

'আমি সবকিছু পরিমিত করে সৃষ্টি করেছি' *(সূরা আল-ক্বামার ৫৪:৪৯)*।

(২) أسماء الشرط 'শর্তের অর্থ জ্ঞাপক বিশেষ্য'।

যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

‘যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে, সে তার নিজের জন্যই করে’(*সূরা আল-জাছিয়া ৪৫:১৫*)।

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

‘তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকেই আল্লাহ তা‘আলার চেহারা রয়েছে’ (*সূরা আল-বাক্বারা ২:১১৫*)।

(৩) أسماء الاستفهام **‘প্রশ্নবোধক বিশেষ্য’**।

যেমন: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

‘কে তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয় প্রবাহমান পানি? (*সূরা আল-মূলক ৬৭:৩০*)।

مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

‘তোমরা রসূলদের কি জবাব দিয়েছিলে?’ (*সূরা আল-ক্বাছাছ ২৮:৬৫*)।

فأين تذهبون

‘তোমরা যাচ্ছো কোথায়?’ (*সূরা আত-তাকভীর ২৯:২৬*)।

(8) (الأسماء الموصولة) সম্বন্ধসূচক বিশেষ্য।

যেমন: আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [الزمر:٣٣].

‘যারা সত্য এনেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাইতো আল্লাহভীরু’ (*সূরা আয-যুমার ৩৯:৩৩*)। তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

‘যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো’ (*সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৬৯*)।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى

'যারা ভয় করে, তাদের জন্য এতে উপদেশ রয়েছে' *(সূরা আন-নাযি'আত ৭৯:২৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

'আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু আল্লাহ তা'আলার জন্যই' *(সূরা আলে ইমরান ৩:১২৯)*।

(৫) **النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري** (না-বোধক অথবা নিষেধসূচক অথবা শর্ত কিংবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নবোধক শব্দের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য ব্যবহৃত হওয়া। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وما من إله إلاّ الله

'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই' *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৬২)*। তিনি আরো বলেন,

واعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئاً

' আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না'*(সূরা আন-নিসা ৪:৩৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

'তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন করো আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত' *(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৪)*।

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

'আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা শুনবে না?'*(সূরা ক্বাছাছ ২৮:৭১)*।

(৬) المعرف بالإضافة 'বিশেষ্যপদ إضافة বা সম্বন্ধসূচক পদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হওয়া, হোক তা একবচন অথবা বহুবচন। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم

‘তোমরা ঐ নি‘আমতের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন’ *(সূরা আ‘রাফ ৭:৭৪)*।

(৭) المعرف بأل الاستغراقية ‘সমুদয় অর্থ জ্ঞাপক أل এর মাধ্যমে বিশেষ্যপদ নির্দিষ্ট হওয়া, হোক তা একবচন বা বহুবচন’। যেমন: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً

‘মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে’ *(সূরা নিসা ৪:২৮)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم

‘তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে’ *(সূরা আন-নূর ২৪:৫৯)*।

কোন বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার অবগত হওয়া অনুসারে أل العهدية দ্বারা মা‘রেফা বা নির্দিষ্ট হয়। যদি তাদের জ্ঞাত বিষয়টি عام হয়, তাহলে এ أل দ্বারা মা‘রেফা বা নির্দিষ্ট শব্দটি عام হবে। আর শব্দের জ্ঞাত বিষয়টি خاص হলে أل দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদটিও خاص হবে।[৬৫]

---

৬৫. ال তিন প্রকার। العهدية –الجنسية– الاستغراقية। এর মধ্যে শুধুমাত্র عام –"ال الاستغراقية" এর ফায়দা দেয়। এই ال চেনার উপায় হলো: ال-এর স্থলে كل শব্দ ব্যবহৃত করা শুদ্ধ হবে। যেমন: আয়াতের الانسان শব্দটির ال হলো الاستغراقية । কাজেই উক্ত ال এর স্থলে كل শব্দ ব্যবহার করলেও অর্থের কোন পরিবর্তন হবে না। আবার অন্যভাবেও এটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

যেমন: ১. ذكري -যেখানে উদ্দেশ্য পূর্ণ বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা থাকে। যেমন: فعصى فرعون الرسول -আয়াতে الرسول দ্বারা উদ্দেশ্য মূসা (আ.), যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। ২. حضوري -উদ্দেশ্যপূর্ণ বিষয়টি উপস্থিত থাকে। যেমন বলা: أكرم الرجل ৩. ذهني -উদ্দেশ্যপূর্ণ জিনিস বক্তা ও শ্রোতার মস্তিস্কে থাকে। যেমন: তুমি বলবে, قال الإمام এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম আহমাদ।

مثال العام– ‘আম এর উদাহরণ:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ} [ص: ٧١]

‘স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতামণ্ডলীকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কাদা-মাটি থেকে’ *(সূরা ছ্বদ ৩৮:৭১)*। তিনি আরোও বলেন,

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

‘যখন আমি তাকে সুষম করলাম এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম, তখন তারা তার প্রতি সিজদাবনত হল’ *(সূরা ছ্বদ ৩৮:৭২)*।

فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

‘তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজাদাবনত হলো’ *(সূরা ছ্বদ ৩৮:৭৩)*।[৬৬]

ومثال الخاص–খাছ্ব এর উদাহরণ:

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً

‘যেমন পাঠিয়েছিলাম ফির‘আউনের নিকট রসূল’ *(সূরা মুযাম্মিল ৭৩:১৫)*।

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً

‘ফির‘আউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম’ *(সূরা মুযাম্মিল ৭৩:১৫)*।

جنس জিনস বা জাতিবাচক أل দ্বারা বিশেষ্যপদ মা‘রেফা বা নির্দিষ্ট হলে ঐ পদটি তার সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করে না। অতএব, যখন তুমি বলো, নারী অপেক্ষা পুরুষ উত্তম। একথার দ্বারা এটা উদ্দেশ্যে নয় যে, প্রত্যেক পুরুষ লোক প্রত্যেক

৬৬.আয়াতের দ্বিতীয় الْمَلَائِكَةُ এর ال হলো العهدية, এর দ্বারা الاستغراق বা عام এর অর্থ উদ্দেশ্য হবে। কেননা, প্রথম الْمَلَائِكَةُ এর ال হলো الاستغراقية

নারী থেকে উত্তম। বরং উদ্দেশ্যে হলো নারী জাতি থেকে পুরুষ জাতি উত্তম। যদিও কতিপয় নারী কতিপয় পুরুষ থেকে উত্তম।

العمل بالعام - ব্যাপক অর্থবোধক শব্দানুসারে আমল করা

عام 'আম শব্দের ব্যাপক অর্থ অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক, যতক্ষণ না তার নির্দিষ্টতা প্রমাণ হয়। আল-কুরআন ও হাদীছের বক্তব্যের মর্মার্থের দাবী অনুসারে আমল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তার বিপরীতে কোন দলীল পাওয়া যায়।

عام নির্দিষ্ট কারণের প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হলেও তার ব্যাপকতা অনুসারে আমল করা ওয়াজিব। কেননা, শব্দের ব্যাপকতাই ধর্তব্য, নির্দিষ্ট কারণ ধর্তব্য নয়। তবে কোন দলীলের মাধ্যমে যদি عام নির্দিষ্টতার অর্থ দেয়, যা ঐ কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যে কারণের প্রেক্ষিতে আম বর্ণিত হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে عام তার সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের সাথে খাছ বা নির্দিষ্ট হবে।

عام কে খাছ বা নির্দিষ্টকারী দলীল নেই- এর উদাহরণ হলো: যিহারের আয়াতসমূহ। কেননা, আউস ইবনে ছামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যিহার করার কারণে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। অতএব, যিহারের হুকুম আউস ইবনে ছামিতসহ সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য হবে। عام কে খাছ বা নির্দিষ্ট করার উদাহরণ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

لَيس منَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

'সফরে ছিয়াম পালন করা পুণ্যের কাজ নয়'।[৬৭]

এ হাদীছটি বর্ণিত হওয়ার কারণ হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। অতঃপর তিনি মানুষের সমাবেশ লক্ষ্য করলেন, সেখানে এক ব্যক্তিকে ছায়া দেয়া হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি হচ্ছে? ছাহাবীগণ বললেন, তিনি ছিয়াম রেখেছেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, সফরে ছিয়াম পালন করা পুণ্যের কাজ নয়।

৬৭. ছ্বহীহ বুখারী ১৯৪৬।

এখানে এই عام কথাটি ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, যার অবস্থা এ ব্যক্তির অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তা হলো, সফরে ছিয়াম পালন করা যার জন্যই কষ্টকর হবে। উক্ত عام কে এভাবে খাছ করার দলীল হলো সফর কষ্টকর না হলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ছিয়াম রাখতেন। আর পুণ্যহীন কাজ তিনি কখনই পালন করেন না।

خاص বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ

خاص এর সংজ্ঞা: আভিধানিকভাবে خاص শব্দটি عام এর বিপরীত।

পারিভাষিক অর্থ:

اللَّفْظُ الدال عَلَى مَحْصُور بِشَخْصٍ أَو عَدَد، كَأَسْمَاء الأَعْلَامِ والإِشَارَة والعُدَد

'خاص এমন শব্দ, যা কোন ব্যক্তি বা সংখ্যা দ্বারা সীমায়িত কোন কিছুকে বুঝায়। যেমন: নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম, ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রভৃতি'।

আমাদের ভাষ্য:على محصور বা 'সীমায়িত' অংশটুকুর মাধ্যমে عام বিলুপ্ত হয়েছে।

التخصيص (নির্দিষ্ট করা) এর সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: এ শব্দটি التعميم বা ব্যাপক করণের বিপরীত। **পারিভাষিক অর্থ:**

إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ.

'التخصيص (নির্দিষ্ট করা) হলো العام এর কিছু একককে বের করে দেওয়া'।

اَلْمخَصِّص (ছোয়াদ বর্ণে যের দিয়ে): এর অর্থ হবে خاص কারী। আর তিনি হলেন শরী'আত প্রণেতা। শব্দটি ঐ দলীলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়, যার

মাধ্যমে خاص করা হয়। خاص করার দলীল দু'প্রকার। যেমন: ১.متصل (সংযুক্ত দলীল) ২. منفصل (আলাদা দলীল)।

১.متصل (সংযুক্ত দলীল): হলো যা স্বতন্ত্র আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় না।

২. منفصل (অসংযুক্ত দলীল): যা স্বতন্ত্র আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়।[৬৮]

সংযুক্ত خاص কারী দলীলের অন্যতম হলো:

প্রথমত استثناء :এটি আভিধানিকভাবে الثني থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো, কোন জিনিসের কিছু অংশকে অন্যে অংশের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। যেমন:ثني الحبل - দড়ির একাংশকে অপর অংশের উপর রাখা।

পারিভাষিক অর্থ:

---

৬৮. একটি শব্দের অর্থের আওতায় যতগুলি একক রয়েছে, যদি ঐ শব্দ দ্বারা সবগুলো একক বুঝায়, তাহলে ঐ শব্দকে عام বলে। অতঃপর কোন শব্দ যদি عام এর কিছু একককে হুকুমের সাথে নির্দিষ্ট করে অন্য কিছু একককে বের করে দেয়, তবে তাকে خاص বলে। যেমন: কুরআনে বলা আছে-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

এখানে প্রথম আয়াতের الإنسان দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষ। কাজেই শব্দটি عام। কিন্তু পরের আয়াতগুলো প্রথম আয়াতের عام কে خاص করে দিয়েছে। কাজেই এখন সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত নয়। বরং যারা ঈমান আনে না এবং সৎকর্ম করে না, তারাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত।

অতঃপর যে দলীল عام কে خاص করে দেয়, তা দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। যদি خاص কারী দলীল عام এর সাথে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে متصل বলে। যেমনটি আমরা উপরোক্ত আয়াতগুলোতে عام এবং خاص কারীকে একই সাথে উল্লেখিত দেখলাম। পক্ষান্তরে خاص কারী দলীল যদি عام এর সাথে সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত না হয়ে আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে منفصل বলে। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ** 'আসমানী বৃষ্টিতে ফসল উৎপন্ন হলে তাতে এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে' *(বুখারী, হা/১৪৮৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, **وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ** 'পাঁচ 'ওয়াসাক্ব'-এর কম ফসল হলে তাতে যাকাত লাগবে না' *(বুখারী, হা/১৪৪৭)*। এখানে পরের হাদীছটি আগের হাদীছকে خاص করেছে এবং উভয়ই আলাদা হাদীছ।

إِخْرَاجُ بعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ بِإِلَّا أَو إِحْدَى أَخَوا تِهَا

'استثناء' হলো إلا বা তার সমগোত্রীয় কোন অব্যয়ের মাধ্যমে عام এর কিছু একককে বের করে দেওয়া। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالِحات وتَواصوا بالْحَقِّ وتَواصوا بِالصَّبْرِ (٣)

'নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে ধৈর্য্যের' *(সূরা আল-আছর ১০৩:২-৩)*।

আমাদের বক্তব্য: بإلا أو إحدى أخواتها বা إلا বা তার সমগোত্রীয় কোন অব্যয়ের দ্বারা شرط ও অন্যান্য উপায়ে خاص করার বিষয়টিবের হয়ে গেছে।[৬৯]

استثناء এর শর্ত : استثناء শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

(১) استثناء টি مستثنى منه এর সাথে প্রকৃতভাবে অথবা হুকুমের দিক থেকে সংযুক্ত থাকবে।

প্রকৃতভাবে متصل বা সংযুক্ত থাকা হলো: حرف الاستثناء টি مستثنى منه এর সাথে এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকা যে, উভয়ের মাঝে কোন فاصل বা বিভাজনকারী শব্দ থাকে না।

হুকুমের দিক থেকে متصل বা সংযুক্ত থাকা হলো: উভয়ের মাঝে এমন فاصل থাকে, যা প্রতিরোধ করা যায় না। যেমন: হাঁচি, কাশি ইত্যাদি।

যদি উভয়ের মাঝে এমন فاصل আসে, যা প্রতিরোধ করা সম্ভব অথবা উভয়ের মাঝে নীরব থাকে, তাহলে استثناء শুদ্ধ হবে না। যেমন: এটা বলা যে, আমার দাসগুলো স্বাধীন। এটা বলার পর যদি চুপ থাকে অথবা অন্য কোন কথা বার্তা

৬৯. عام কে বিভিন্ন উপায়ে خاص করা যায়। যেমন: শর্ত, গুণবাচক শব্দ, حرف الاستثناء ইত্যাদি। কিন্তু এখানে শুধু শেষোক্তটি বিবেচ্য।

বলে; অতঃপর বলে, তবে যায়েদ ব্যতীত, তাহলে এভাবে বলাতে استثناء শুদ্ধ হবে না। বরং সবাইকে স্বাধীন করতে হবে।

কারো মতে, মাঝখানে চুপ থাকলে অথবা فاصل থাকলেও استثناء শুদ্ধ হবে, যদি চুপ থাকা বা বিভাজনকারীর আগে ও পরের কথা একই প্রসঙ্গে হয়। এ ব্যাপারে দলীল হলো,

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীছ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা যখন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই তিনি এ শহরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং এখানের কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ কেটে ফেলা যাবে না এবং এখানকার ঘাসও মূলোৎপাটন করা যাবে না। তখন ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: হে আল্লাহ তা'আলার রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'ইযখির' ঘাস ব্যতীত। কারণ এটি আমাদের কবর ও ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তিনি বললেন: তবে 'ইযখির' ঘাস ব্যতীত।

অত্র হাদীছটি এর উপর প্রমাণ বহন করার কারণে এ মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য।

(২) مستثنى টি مستثنى منه এর অর্ধেকের বেশি হবে না। সুতরাং কেউ যদি বলে, আমার কাছে সে ছয় কম দশ দিরহাম পাবে। এভাবে استثناء শুদ্ধ হবে না। সুতরাং তাকে দশ দিরহামই প্রদান করতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, এটি শর্ত নয়। কাজেই استثناء শুদ্ধ হয়ে যাবে, যদিও مستثنى টি مستثنى منه এর অর্ধেকের বেশি হয়। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে তারজন্য চার দিরহাম প্রদান করাই আবশ্যক হবে; বেশী নয়।[৭০]

কিন্তু যদি সম্পূর্ণটাকেই استثناء করে, তাহলে উভয় মত অনুসারেই استثناء শুদ্ধ হবে না। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বলে, সে আমার কাছে দশ কম দশ দিরহাম পাবে, তাহলে তার উপর পুরো দশ দিরহামই প্রদান করতে হবে।

استثناء যখন সংখ্যাবাচক হবে, তখনউক্ত শর্তটি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু استثناء যদি গুণবাচক হয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে, যদিও مستثنى منه থেকে مستثنى সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ বেরিয়ে যায়। যেমন: ইবলীসের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

৭০. এ ব্যাপারে দ্বিতীয় মতটিই সহীহ।কাজেই مستثنى টি مستثنى منه এর অর্ধেকের বেশি হলেও استثناء শুদ্ধ হয়ে যাবে।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

'যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে' *(সূরা হিজর ১৫:৪২)*। অথচ আমরা জানি, বনু আদমের সন্তানদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ইবলীসের অনুসারী।

এমনকি যদি বলি: أعط من في البيت إلا الأغنياء 'বাড়ীতে যারা আছে, তাদেরকে দান করো, তবে ধনীদের নয়'। অতঃপর দেখা গেল যে, বাড়ীর সবাই ধনী, তাহলেও استثناء শুদ্ধ হবে এবং কাউকেই কিছু দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়ত: خاص কারী দলীল, যা مستثنى منه-এর সাথে সংযুক্ত থাকে, তার মধ্যে আরেকটি হলো الشرط (শর্ত)। **شرط এর আভিধানিক অর্থ হলো:** আলামত বা নিদর্শন। এর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো:

تَعْلِيقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وجودًا أَو عدَمًا بِإِنْ الشَّرْطِيَّة أَو إِحْدَى أَخَواتِهَا

'কোন কিছুর অস্তিত্ব লাভ করা বা না করার ক্ষেত্রে শর্তবোধক إِنْ বা তার সমগোত্রীয় অব্যয়ের মাধ্যমে কোন বস্তুকে অপর কোন বস্তুর সাথে ঝুলিয়ে দেয়া'।

شرط– عام কে خاص করে দেয়। চাই শর্তটি مستثنى منه এর আগে ব্যবহৃত হোক অথবা পরে ব্যবহৃত হোক। شرط আগে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ হলো: মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

'কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছ্বলাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও' *(সূরা আত-তাওবাহ ৯:৫)*।

شرط পরে আসার উদাহরণ হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

'তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে' (সূরা আন-নূর ২৪:৩৩)।

তৃতীয়ত: صفة বা গুণবাচক শব্দ। আর তা হচ্ছে,

ما أُشْعِرُ بِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضَ أَفْرَادِ الْعَامِّ مِنْ نَعْتٍ أَوْ بَدَلٍ أَوْ حَالٍ

'যা গুণ, বদল, অবস্থা ইত্যাদির প্রতি নির্দেশ করে, যার সাথে عام এর কিছু فرد (একক) বিশেষিত থাকে, তাকে صفة ছিফাত বলে'। যেমন:

نعت (গুণ) এর উদাহরণ হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ

'সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে' *(সূরা আন-নিসা ৪:২৫)*।[৭১]

بدل এর উদাহরণ হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

'এ ঘরের হাজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার' *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৯৭)*।[৭২]

حال এর উদাহরণ হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিমকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে' *(সূরা আন-নিসা ৪:৯৩)*।[৭৩]

---

৭১. অর্থাৎ প্রথমে فَتَيَاتِكُمْ বলাতে সব দাসীকে বিবাহ করা বুঝাচ্ছিল। কিন্তু পরের الْمُؤْمِنَات গুণবাচক শব্দ দ্বারা শুধু মাত্র মুমিন দাসী খাস হয়ে গেলো।

৭২. আয়াতে النَّاس বলাতে সব মানুষের উপর হজ্জ ফরয বুঝা যাচ্ছিল। কিন্তু النَّاسِ থেকে بدل হওয়া مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا বলাতে হজ্জের বিধানটি যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের সাথে খাছ হয়ে গেলো।

৭৩. আয়াতে مُتَعَمِّدًا না বলা হলে অর্থ হতো কাউকে হত্যা করলেই তার পরিণাম জাহান্নাম হবে। কিন্তু শব্দ দ্বারা হুকুমটি খাছ হয়ে গেলো যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাদের সাথে।

خاص কারী বিচ্ছিন্ন দলীল:

خاص কারী বিচ্ছিন্ন দলীল হলো: যা আলাদাভাবে আসে। এগুলি ৩টি। যথা:

১. الحس (অনুভূতি) ২. العقل (বিবেক) ৩. الشرع (শরী'আত)

الحس বা অনুভূতির মাধ্যমে خاص করার দলীল হলো: 'আদ জাতির উপর প্রেরিত বায়ু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

'তার পালনকর্তার আদেশে সেসব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে' *(সূরা আল-আহক্বাফ ৪৬:২৫)*।

আমাদের অনুভূতি প্রমাণ করে যে, উক্ত বায়ু আসমান ও যমীনকে ধ্বংস করেনি। জ্ঞানের মাধ্যমে عام কে خاص করার দলীল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ

'আল্লাহ সর্বকিছুর স্রষ্টা'।

আমাদের জ্ঞান প্রমাণ করে যে, তার সত্তা সৃষ্ট নয়।

কিছু বিদ্বান মনে করেন, জ্ঞান ও অনুভূতির মাধ্যমে যে خاص হয়, এটি মূলত عام থেকে খাস হয়নি। বরং এটি এমন عام যার দ্বারা خاص উদ্দেশ্য। কারণ خاص কৃত বিষয়টি শুরু থেকেই বক্তা বা শ্রোতা কারোই উদ্দেশ্য ছিলো না। এটি হলো বাস্তবে ঐ عام , যা দ্বারা خاص উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত: শরী'আতের মাধ্যমে خاص করা। কেননা কুরআন ও হাদীছকে অনুরূপ জিনিস অর্থাৎ কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াস দ্বারা خاص করা হয়।

কুরআনকে কুরআন দ্বারা خاص করার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

'আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২২৮)*। উক্ত আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা خاص হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই' *(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৪৯)*।[৭৪]

কুরআনকে হাদীছ দ্বারা خاص করার দলীল হলো মীরাছের আয়াত:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান'*(সূরা আন-নিসা ৪:১১)*।

এ আয়াত এবং এর মত অন্যান্য আয়াতসমূহ নিচের হাদীছ দ্বারা خاص হয়েছে: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

'কোন মুসলিম কাফের ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং কোন কাফের কোন মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবে না'।[৭৫]

কুরআনকে 'ইজমা'-এর মাধ্যমে خاص করার দলীল হলো:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে' *(সূরা আন-নূর ২৪:৬৪)*।

আয়াতটি নিম্নোক্ত ইজমার মাধ্যমে خاص হয়েছে: এখানে ইজমা হলো অপবাদ দানকারী দাসকে ৪০ টি বেত্রাঘাত করা হবে।

---

৭৪. প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, কোন নারী তালাকপ্রাপ্তা হলেই তাকে তিন হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে উক্ত হুকুম খাছ হয় যে, যদি বিবাহের পর মেলামেশা করার আগেই তালাক হয়, তাহলে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না।

৭৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪২৮৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬১৪।

উক্ত উদাহরণটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আমি এর ত্রুটিমুক্ত কোন উদাহরণ খুঁজে পাইনি।[৭৬]

ক্বিয়াসের মাধ্যমে কুরআনকে خاص করার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর'*(সূরা আন-নূর ২৪:২)*।

প্রসিদ্ধ মতানুসারে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দাসীর শাস্তির অর্ধেক করে পঞ্চাশ বেত্রাঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর ব্যভিচারী দাসকে ক্বিয়াস করে অত্র আয়াতটি خاص করা হয়েছে।[৭৭] হাদীছকে কুরআন দ্বারা خاص করার উদাহরণ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

'আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষদের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রসূল'।[৭৮]

হাদীছটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা خاص হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা

---

৭৬. অর্থাৎ দাস অপবাদ দিলে তাকে অর্ধেক শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে সব বিদ্বান একমত নন। বরং কিছু বিদ্বান তাদেরকে স্বাধীন ব্যক্তির মতই ৮০ টি বেত্রাঘাত করার কথা বলেছেন (সূরা নূর/২)।

৭৭. অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যভিচার করবে, তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে। কিন্তু দাসী যেনা করলে, তাকে ৪০ বেত্রাঘাত করা হয়। দাসীর উপর দাসকে কিয়াস করে দাসকেও ৪০ বেত্রাঘাত করার বিধানের মাধ্যমে আয়াতটি খাছ করা হয়।

৭৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৯৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০

হারাম জানে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দীন, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে' *(সূরা আত-তাওবাহ ৯:২৯)*।

হাদীছকে হাদীছের মাধ্যমে خاص করার উদাহরণ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

فيما سقت السَّماء العشْر

'আসমানী বৃষ্টিতে ফসল উৎপন্ন হলে তাতে এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে'।[৭৯] অত্র হাদীছটি নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা خاص করা হয়েছে:

لَيس فيما دونَ خَمْسة أَوْسقٍ صدقَةٌ

'পাঁচ 'ওয়াসাক্ব'-এর কম ফসল হলে তাতে যাকাত লাগবে না'।[৮০]

ইজমার মাধ্যমে হাদীছকে خاص করার কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাইনি।

ক্বিয়াসের মাধ্যমে হাদীছকে خاص করার উদাহরণ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْبكْرُ بالْبكْرِ جلْدُ مائَة وتَغْرِيبُ عامٍ

'অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে যেনা করলে একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে'।[৮১]

প্রসিদ্ধ মতানুসারে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দাসীর শাস্তি অর্ধেক করে পঞ্চাশ বেত্রাঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর ব্যভিচারী দাসকে ক্বিয়াস করে হাদীছকে خاص করা হয়েছে।

---

৭৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪৮৩

৮০. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪৮৪। অর্থাৎ প্রথম হাদীছ দ্বারা বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন যে কোন পরিমাণ ফসলে যাকাত ফরয বুঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছটি যাকাত খাছ করে দিচ্ছে ফসল নূন্যতম পাঁচ ওয়াসাক হওয়ার সাথে। উল্লেখ্য যে, এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা'; এক সা' সমান ২ কেজী ৪০ গ্রাম ভাল গম। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক হলো: ৩০০ সা' =৬১২ কেজি বা ১৫.৩ মণ বা ১৫ মণ ১২ কেজি।

৮১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৯০

المُطلَقوالمقَيد 'মুতলাক্ব' ও 'মুক্বাইয়্যাদ'

مطلق (শর্তহীন) এর সংজ্ঞা: আভিধানিকভাবে مطلق **শব্দটি** مقيد এর বিপরীত।

مطلق এর পারিভাষিকঅর্থ:

مَادَلَّ عَلَى الحَقِيقَة بلَا قَيْد

'مطلق হলো যা কোনরূপ শর্ত ছাড়াই কোন حقيقة বা বাস্তবতার প্রমাণ বহনকরে'।[৮২] যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ

'তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে' *(সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৩)*।[৮৩]

সুতরাং আমাদের বক্তব্য: مادَلّعَلىالحَقِيقة (যা কোন حقيقة বা বাস্তবতার প্রমাণবহন করে) এ অংশ দ্বারা عام বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা, এটি عموم এর প্রমাণ বহন করে, শুধুমাত্র শর্তহীন বা সাধারণ বাস্তবতার প্রমাণ বহন করে না।

আমাদের বক্তব্য: بلا قيد (কোনরূপ শর্ত ছাড়াই) এ অংশ দ্বারা مقيد বিলুপ্ত হয়েছে।

مقيد- (শর্তযুক্ত) এর সংজ্ঞা: مقيد এর আভিধানিক অর্থ: উট বা অনুরূপ কোন প্রাণী, যাকে বেড়ী পরানো হয়। পরিভাষায় مقيد বলা হয়:

---

৮২. ইতিপূর্বে আমরা দেখে এসেছি, 'আম' সীমাহীনভাবে সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু মুতলাক্ব সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং অনির্দিষ্টভাবে কোন একটাকে খাছ করে। এই হচ্ছে, 'আম' ও 'মুতলাক্ব'-এর মধ্যে পার্থক্য। এতদুভয়ের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য হলো, 'আম'-এর মধ্যে 'ইস্তিছনা' আসে; কিন্তু মুতলাক্বে 'ইস্তিছনা' আসে না।

৮৩. অত্র আয়াতটি যিহারের কাফফারা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে দাস মুক্ত করতে বলা হয়েছে। এতে দাসের ক্ষেত্রে মুসলিম বা অমুসলিম হওয়ার কোন শর্ত করা হয়নি।

ما دَلَّ عَلَى الحَقِيقَة بقَيْد

‘مقيد হলো যা কোন শর্তের সাথে حَقِيقَة বা বাস্তবতার প্রমাণ বহন করে’।

যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

‘সে একজন মু‘মিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে’।

আমাদের বক্তব্য: بقيد (কোন শর্তের সাথে) এ শব্দ দ্বারা مطلقবিলুপ্ত হয়েছে।

العمل بالمطلق -মুতলাক্ব অনুযায়ী আমল করা

মুতলাক্ব দলীলের উপর শর্তহীনভাবেই আমল করা ওয়াজিব। তবে মুতলাক্বকে مقيد করে দেয়- এমন দলীল পাওয়া গেলে, (তখন সেভাবেই আমল করতে হবে)। কেননা, কুরআন ও হাদীছের ভাষ্যের মর্মার্থ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না তা থেকে ভিন্নতর কোন দলীল পাওয়া যায়।

যখন কোন مطلق ও مقيد ভাষ্য বর্ণিত হয়, তখন উভয়টির হুকুম একই হলে مقيد দ্বারা مطلق কে مقيد করা ওয়াজিব হবে। অন্যথায় (হুকুম এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হলে) مطلقওمقيدপ্রত্যেকটি যে মর্মে বর্ণিত হয়েছে,তদনুযায়ী আমল করতে হবে।

مطلق ও مقيد উভয়টির হুকুম একই হওয়ায় উদাহরণ হলো, যিহারের[৮৪] কাফ্‌ফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا

‘তাদের কাফফারা এই যে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে’ *(সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৩)*।

---

৮৪. যিহার হলো স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মা, মেয়ে, কন্যা, বোন এরকম কোন মাহরাম নারীর অঙ্গের সাথে তুলনা করা।

হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

'সে একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে' *(সূরা আন-নিসা ৪:৯২)*।

এখানে উভয় ক্ষেত্রে হুকুম একই আর তা হলো দাসমুক্ত করা। তাই ظهار এর মুতলাক্ব বা শর্তহীন কাফ্ফারাকে হত্যার শর্তযুক্ত কাফ্ফারা দ্বারা مقيد করা হবে।

অতএব, উভয় কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে দাসের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত।

مطلق মুত্বলাক্ব ও مقيد মুক্বাইয়িদ উভয়টির হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার উদাহরণ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

'পুরুষ চোর ও নারী চোরউভয়ের হাত কেটে দাও' *(সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৮)*।

অপর দিকে ওযু সম্পর্কে তার বাণী:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

'তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো' *(সূরা আল-মায়িদা ৫:৬)*।

এখানে উভয় ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটি হাত কাটা আর দ্বিতীয়টিতে হাত ধোয়া। কাজেই দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটি مقيد করা যাবে না। বরং এটি مطلق এর উপরই বহাল থাকবে। সুতরাং হাত কাটার বিধানটি কব্জি পর্যন্ত হবে আর হাত ধোয়ার বিধান কনুই পর্যন্ত হবে।[৮৫]

---

৮৫. অর্থাৎ প্রথম হাত কাটার বিধানটি মুতলাক্ব বা শর্তহীনভাবে এসেছে। আয়াতে উল্লেখ নেই যে, হাত কোন পর্যন্ত কাটতে হবে। পরের আয়াতে হাত ধোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, মুকাইয়্যাদ বা শর্তযুক্তভাবে অর্থাৎ কনুই পর্যন্ত। এখানে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াতকে শর্তযুক্ত করে বলা যাবে না যে, হাত কনুই পর্যন্ত কাটতে হবে। কেননা, উভয় আয়াতের হুকুম আলাদা। প্রথম আয়াতে হাত কাটা আর দ্বিতীয় আয়াতে হাত ধোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই উভয় আয়াতকে আলাদা আলাদাভাবে আমল করতে হবে। দ্বিতীয় আয়াত অনুসারে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া হবে। হাদীছের নির্দেশনা অনুসারে কব্জি পর্যন্ত হাত কাটা হবে।

المجمل والمبين 'মুজমাল' ও 'মুবাইয়্যান'

مجمل এর আভিধানিক অর্থ: অস্পষ্ট, ব্যাখ্যাহীন, সামষ্টিক ইত্যাদি। **পারিভাষিক অর্থ:**

ما يَتَوَقَّفُ فَهْم المُرَاد مِنْهُ عَلَى غَيْرِه إِمَّ افِي تَعْيِينه أَو بَيَان صِفَته أَو مِقْدَاره

'مجمل ঐ শব্দকে বলে, যার উদ্দিষ্ট বুঝ অন্যের উপর নির্ভর করে; হয় সেটাকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে বা নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনার ক্ষেত্রে বা পরিমাণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে'।

নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে যা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় তার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء

'তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২২৮)*।

কেননা قرء ক্বুরু শব্দটি حيض হায়েয ও طهر তুহুর উভয় অর্থের সমষ্টি। কাজেই এর মধ্যে যে কোন একটি নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে ভিন্ন দলীলের প্রয়োজন।

গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে যা অন্যের উপর নির্ভরশীল, তার দৃষ্টান্ত: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

'তোমরা ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করো' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)*। এখানে ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি অজ্ঞাত, যার বিবরণ জানা প্রয়োজন।

পরিমাণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যা অন্যের মুখাপেক্ষী, তার উদাহরণ:

وَآتُوا الزَّكَاةَ

'তোমরা যাকাত প্রদান করো' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)*। এখানে যাকাতের নিসাব অজ্ঞাত, যার বিবরণ প্রয়োজন।

تعريف المبيَّن –মুবীন এর সংজ্ঞা: **مبين** এর আভিধানিক অর্থ: স্পষ্ট, ব্যাখ্যাকৃত।

مبين এর পারিভাষিক অর্থ:

ما يفْهَم المُرادَ منْهُ إمَّا بأَصلِ الوضْعِ أَو بعْدَ التَّبيين

'যে শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায়, হয় সৃষ্টিগতভাবে অথবা বর্ণনা করার পর, তাকে **مبين মুবীন** বলে।'

যার উদ্দিষ্ট মর্মার্থ সৃষ্টিগতভাবে বুঝা যায়, তার উদাহরণ: আসমান, যমীন, পাহাড়, মানুষ, যুলুম, সততা এ ধরনের শব্দের উদ্দিষ্ট মর্মার্থ সৃষ্টিগতভাবেই জানা যায়। এদের অর্থের জানার জন্য অন্য শব্দের মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

যে শব্দের উদ্দিষ্ট মর্মার্থ স্পষ্ট করার পর বুঝা যায়, তার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

'তোমরা ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত দাও' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)*।

এখানে **إقامة** ইক্বামাহ (প্রতিষ্ঠা করা) ও **إيتاء** ঈতাউ (প্রদান করা) শব্দ দু'টি مجمل মুজমাল শব্দ। কিন্তু শরী'আত প্রণেতা তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাই বর্ণনা করার পর সেটি **مبين** মুবীন শব্দে পরিণত হয়েছে।

العمل بالمجمل – অনুযায়ী আমল করা

শরী'আতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো مجمل অনুযায়ী আমল করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, যখন তা স্পষ্ট হবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরী'আতের মৌলিক ও শাখাগত সমস্ত বিষয় তার উম্মতের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তিনি এ উম্মতকে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন শরী'আতের উপর রেখে গিয়েছেন; যার রাত দিবালোকের মতই। তিনি প্রয়াজনীয় মুহূর্ত কখনই বিবরণ দেওয়া ছেড়ে দেননি।

তার বিবরণ কথার মাধ্যমে হতে পারে অথবা কর্মের মাধ্যমে হয় অথবা কথা ও কর্ম উভয়ের মাধ্যমে হতে পারে।

কথার মাধ্যমে বিবরণের উদাহরণ: যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া। যেমন তিনি বলেছেন:

فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ العُشْرُ

'বৃষ্টির পানিতে যে শষ্য উৎপন্ন হয়, তাতে এক দশমাংশ ওশর দিতে হবে'।

এটি হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত مجمل বাণীর بيان বা ব্যাখ্যা:

وَآتُوا الزَّكَاةَ

'তোমরা যাকাত প্রদান করো' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)*।

কর্মের মাধ্যমে বিবরণ দেওয়ার উদাহরণ: উম্মাতের সামনে হাজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করা; এটি আল্লাহ তা'আলার নীচের مجمل (ব্যাখ্যাহীন) আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

'এ ঘরের হাজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার'। *(সূরা আলে ইমরান ৩:৯৭)*

অনুরূপভাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক صلوة الكسوف বা সূর্য গ্রহণের ছ্বলাত যথা-নিয়মে সম্পন্ন করা। এটি বাস্তবে তার নিম্নোক্ত مجمل (ব্যাখ্যাহীন) বাণীর ব্যাখ্যা:

فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا

'যখন তোমরা তাতে কোন কিছু হতে দেখবে, তখন ছ্বলাত আদায় করবে'।[৮৬]

কথা ও কর্ম উভয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যার উদাহরণ: ছ্বলাত আদায়ের পদ্ধতির বিবরণ। কেননা, এ বিবরণ কথার মাধ্যমে হয়েছিলো। যেমন: ছ্বলাতে ভুলকারী সম্পর্কে হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ

'যখন তুমি ছ্বলাতে দাঁড়াতে ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলবে'।[৮৭]

৮৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৮৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯১১।

আবার তার কর্মের মাধ্যমেও এর বিবরণ হয়েছিল। যেমন: সাহল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীছে রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীর দিলেন এবং তার পেছনে লোকজনও তাকবীর দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি মিম্বারের উপর ছিলেন। অত্র হাদীছে আরো আছে, তারপর তিনি লোকদের অভিমুখী হলেন এবং বললেন: আমি এ রকম করলাম, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পারো এবং আমার ছ্বলাত তোমরা শিখে নিতে পারো।

الظاهر والْمؤَوَّلُ 'যাহির' ও 'মুআওয়াল'[৮৮]

الظاهر যাহির এর আভিধানিক অর্থ: স্পষ্ট, প্রকাশ্য। **পারিভাষিক অর্থ:**

ما دَلَّ بنفْسه علَى معنى راجحٍ مع احْتَمال غَيْرِه

'الظاهر যাহির হলো, যা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে অগ্রগণ্য অর্থ বুঝায়, যদিও সেখানে ভিন্ন অর্থ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে'। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

تَوضَّؤوا منْ لُحُوم الْإبلِ

'উটের গোশত ভক্ষণ করলে ওযু করবে'।[৮৯]

৮৭.ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৭, ইবনে মাজাহ হা/১০৬০।

৮৮. যে শব্দ শুধুমাত্র একটি অর্থ প্রদান করে, একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে না, তাকে النص বলে। পক্ষান্তরে যে শব্দ একাধিক অর্থের সম্ভবনা রাখে, তাকে المشترك বলে। অতঃপর একাধিক অর্থের মাঝে মুজতাহিদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একটিকে অগ্রাধিকার দেন, সেটাকে الظاهر বলে। আর যে অর্থের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাকে বলে المؤول।

৮৯.মুসনাদে আহমাদ; ৪/৩৫২, আবু দাউদ /১৮৪, ছ্বহীহ মুসলিম/ ৩৬০।

এখানে 'ওযু' দ্বারা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে الظاهر যাহির হলো শারঈ নিয়মে চার অঙ্গ ধৌত করে ওযূ করা; ঐ وضوء ওযু উদ্দেশ্য নয়, যার অর্থ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। আমাদের বক্তব্য: **ما دلّ بنفْسه على معنى** (যা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে কোন অর্থ বুঝায়) এ অংশ দ্বারা مجمل (অস্পষ্ট) বিষয় বুঝাবে না। কেননা, مجمل স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে অর্থের উপর প্রমাণ করতে পারে না।

راجح রজিহ (অগ্রগণ্য) এ শব্দ দ্বারা المؤول 'মুআওয়াল' আলাদা হয়েছে। কেননা, পূর্বাপর ইঙ্গিত না থাকলে المؤول শব্দ مرجوح মারজূহ অর্থ বুঝায়। مع احتمال غيره (যদিও সেখানে ভিন্ন অর্থ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে) সর্বশেষ এ অংশ দ্বারা نص বা সুস্পষ্ট ভাষ্য পৃথক হয়েছে। কেননা, نص কেবল একটি অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে।

العمل بالظاهر – যাহির অনুযায়ী আমল করা প্রসঙ্গে:

الظاهر যাহির অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। তবে যদি এমন দলীল পাওয়া যায়, যা তাকে ظاهر যাহির বা বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়, তাহলে ঐ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এটাই হলো সালাফ বা পূর্ববর্তী বিদ্বানদের কর্মপন্থা, যা বেশি সতর্কতামূলক এবং দায়িত্বমুক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী। আর ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী পন্থা।

تعريف المؤول – 'মুআওয়াল' এর সংজ্ঞা:

المؤول শব্দটি আভিধানিকভাবে أول থেকে উদগত। এর অর্থ: প্রত্যাবর্তন করা। **পারিভাষিক অর্থ:**

ما حُمِل لَفْظُهُ عَلَى الْمعنَى الْمرجوحِ

'**مرجوح** মারজূহ বা অগ্রগণ্য নয় এমন অর্থের উপর কোন শব্দের প্রয়োগকে **المؤول** বলে।

আমাদের বক্তব্য: عَلَى الْمعنَى الْمرجوحِ (অগ্রগণ্য নয় এমন অর্থের উপর কোন শব্দের প্রয়োগ) এ অংশ দ্বারা **نص** নছ্ব (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) ও الظاهر যাহির আলাদা হয়েছে। نص নছ্ব (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) আলাদা হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু এটি কেবল একটি অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে। الظاهر যাহির আলাদা হয়েছে। কারণ এটি راجح রজিহ অগ্রগণ্য অর্থের উপর ব্যবহৃত হয়।

والتأويل قسمان – তা'উইল বা ব্যাখ্যা দু'প্রকার। যথা:

(১) **صحيح مقبول** গ্রহণযোগ্য ছ্বহীহ তা'উইল (ব্যাখ্যা)।

(২) **فاسد مردود** প্রত্যাখ্যাত ভুল তা'উইল (ব্যাখ্যা)।

১। **الصحيح** ছ্বহীহ: যে **تأويل** তা'উইল (ব্যাখ্যা) এর উপর বিশুদ্ধ দলীল রয়েছে, সেটাই হলো **التأويل الصحيح** বা বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী: وسْئَلِ الْقَرِيةَ 'জিজ্ঞেস করো জনপদকে (জনপদের অধিবাসীকে)' *(সূরা ইউসূফ ১২:৮২)*।

এখানে **وسْئَلِ الْقَرِيةَ** (জিজ্ঞেস করো জনপদকে)-এর ব্যাখ্যায় আমরা বলি, **وسئل أهل القرية** 'জিজ্ঞেস করো জনপদের অধিবাসীকে'। কেননা, স্বয়ং জনপদকে প্রশ্ন করা সম্ভব নয়।

২। **الفاسد** ফাসিদ (বাতিল-ভ্রান্ত): ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হলো ঐ তা'উইল যার স্বপক্ষে বিশুদ্ধ কোন দলীল নেই। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

'দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন' *(সূরা ত্বা-হা ২০:৫)*।

বাতিলপন্থীরা উক্ত আয়াতের **اسْتَوى** ইসতাওয়া এর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে বলেন, এর অর্থ হলো কর্তৃত্ব লাভ করা। কিন্তু সঠিক অর্থ হলো, সমুন্নত হওয়া। তবে এসবের কোন ধরণ বর্ণনা করা বা উপমা দেওয়া যাবে না।

النسخ -নাসিখ (রহিতকরণ)

النسخ এর সংজ্ঞা: এর আভিধানিক অর্থ: দূর করা, স্থানান্তর করা। **পারিভাষিক অর্থ:**

رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ لَفْظِهِ بِدَلِيلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

'النسخ হলো কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে শারঈ কোন দলীলের হুকুম বা শব্দ উঠিয়ে দেয়া'।

আমাদের বক্তব্য: رَفْعُ حُكْمِ রফউ হুকমিন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুকুম পরিবর্তন করা। যেমন: ওয়াজিব থেকে মুবাহ অথবা মুবাহ থেকে হারামে পরিবর্তন করা।

সুতরাং এর দ্বারা ঐ হুকুম আলাদা হলো, যে হুকুম কোন প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে অথবা শর্ত না পাওয়ার কারণে বিলম্বিত হয়। যেমন: নিসাব পরিমাণ সম্পদ না হওয়ার কারণে যাকাত প্রদানের ফরযিয়্যাত-আবশ্যকতা উঠে যাওয়া অথবা হায়েয অবস্থায় ছলাতের ফরযিয়্যাত উঠে যাওয়া। অতএব, এগুলোকে النسخ হিসাবে অভিহিত করা হবে না।

আমাদের বক্তব্য: لفظه অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শারঈ দলীলের শব্দ। কেননা, النسخ হয়তো বা শব্দের না হয়ে হুকুমের হয় অথবা তার বিপরীত হয়, অর্থাৎ হুকুম রহিত না হয়ে শুধু শব্দ রহিত হয়, অথবা শব্দ ও হুকুম উভয়টিই রহিত হয়, যার বিবরণ অচিরেই আসছে।

আমাদের বক্তব্য: بدليل من الكتاب والسنة (কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে) এ অংশ দ্বারা এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য দলীল যেমন: ইজমা ও ক্বিয়াস আলাদা হয়েছে। সুতরাং এগুলি দ্বারা النسخ সাব্যস্ত হবে না।

নাসিখ বা রহিতকরণ এর যৌক্তিকতা

স্বাভাবিক সুস্থ বিবেকেও 'রহিতকরণ' হওয়া সম্ভব এবং শারঈভাবেও এটি বাস্তবসম্মত বিষয়।

'রহিতকরণ' স্বাভাবিক বিবেক গ্রাহ্য হওয়ার যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে সমস্ত জিনিসের চাবিকাঠি, সেহেতু বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল তারই। কারণ তিনিই প্রতিপালক, অধিপতি। কাজেই তার এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি তার প্রজ্ঞা ও রহমতের দাবি অনুসারে বান্দার জন্য শারঈ বিধান দেবেন।

বাদশা তার প্রজাকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নির্দেশ দিবেন এটা কি বিবেক বাঁধা দেয়?

উপরন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও প্রজ্ঞার দাবি হলো, তিনি তাদের জন্য এমন শারঈ বিধান প্রণয়ন করবেন, যে ব্যাপারে তিনি জানেন যে, এতে তাদের জন্য দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। আর কল্যাণ অবস্থা ও সময়ভেদে বিভিন্ন হয়। কাজেই কোন হুকুম একটি সময়ে বা অবস্থায় বান্দার জন্য অধিকতর কল্যাণ বিবেচিত হয়, আবার অন্য সময় বা অবস্থার প্রেক্ষিতে আরেকটি হুকুম তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ।

শারঈভাবেও এটি বাস্তবসম্মত হওয়ার দলীল হলো:

(১) আল্লাহ তা'আলার বাণী:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

'আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১০৬)*।

(২) আল্লাহ তা'আলার বাণী:

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

'এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন' *(সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)*।

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

'অতএব, এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে (রমাদ্বানের রাতে) সহবাস করতে পারো' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১৮৭)*।

এগুলি পূর্বের হুকুম পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল।

(৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

'আমি তোমদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করবে'।[৯০]

অত্র হাদীছটি 'কবর যিয়ারতের নিষেধাজ্ঞা' রহিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল।

ما يمتنع نسخه – যা 'রহিত হওয়া' নিষিদ্ধ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি রহিত হওয়া নিষিদ্ধঃ

(১) বিভিন্ন সংবাদ (الأخبار) : কেননা, রহিত হওয়ার ক্ষেত্র হলো হুকুম। আর দু'টি সংবাদের একটি রহিত হলে এর যেকোন একটি মিথ্যা হওয়া অবধারিত হয়। আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণনাসমূহে মিথ্যা থাকা অসম্ভব। তবে যদি কোন হুকুম সংবাদের আকৃতিতে আসে, তাহলে সেটি রহিত হওয়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

'যদি তোমাদের মাঝে বিশ জন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে, তবে তারা দু'শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে' *(সূরা আল-আনফাল ৮:৬৫)*।

এটি সংবাদমূলক হলেও এর অর্থ নির্দেশমূলক। এজন্য পরের আয়াতে এটি রহিত হওয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। আর তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। এতএব, তোমাদের মাঝে একশত জন মুজাহিদ থাকলে তারা দু'শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে' *(সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)*।

(২) ঐ সমস্ত বিধি-বিধান যা সর্বযুগে এবং সর্বস্থানে কল্যাণকর (**الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان**): যেমনঃ আল্লাহ তা'আলার একত্ব, ঈমানের

---

৯০. ছ্বহীহঃ সুনানে নাসাঈ হা/৫৬৫২

মৌলিক বিষয়, ইবাদতের মৌলিক বিষয়, সততা, নিষ্কলুষতা, সচ্চরিত্র, বদান্যতা ও বীরত্ব প্রভৃতি রহিত হওয়া সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে যেসব জিনিস সর্বদা মন্দ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ, সেগুলিও রহিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন: শিরক, কুফর, পাপাচার, মিথ্যা, মন্দচরিত্র, কৃপণতা ও কাপুরুষতা ইত্যাদি। কারণ সম্পূর্ণভাবে বান্দার কল্যাণ সাধন এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর এমন জিনিস থেকে বিরত রাখার জন্য শরী'আত প্রণীত হয়েছে।

شروط النسخ – নাসিখ 'রহিতকরণ' এর শর্তসমূহ

যেসব ক্ষেত্রে نسخ সম্ভব, সেসব ক্ষেত্রে نسخ বা 'রহিতকরণ' সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

(১) উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব না হওয়া। তাই উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হলে উভয়টি অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হওয়ার কারণে نسخ সাব্যস্ত হবে না।

(২) ناسخ বা রহিতকারী দলীল পরে আসার ব্যাপারে জানা থাকা। এটি জানা যেতে পারে মূল দলীলের মাধ্যমে অথবা ছাহাবীর সংবাদের মাধ্যমে অথবা ইতিহাসের মাধ্যমে।

'দলীল পরে আসার' বিষয়টি نص (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) এর মাধ্যমে জানা যায়। এর উদাহরণ হলো: রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

إِنِّ قَدْ كُنْتَ أَذِنْتُ لَكُم فِي الا سْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، و إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلكَ إِلَى يومِ الْقِيامة

'আমি তোমাদের জন্য নারীদের সাময়িক বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। আল্লাহ তা'আলা এটাকে ক্বিয়ামত অবধি হারাম করে দিয়েছেন'।[৯১]

৯১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০৬, মুসনাদে আহমাদ

ছাহাবীর সংবাদের মাধ্যমে জানার উদাহরণ হলো, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বক্তব্য:

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ

'কুরআন থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে এটাও ছিল যে, দশ চোষণ দুধ পান করলে হারাম সাব্যস্ত করে। এরপর নির্দিষ্ট পাঁচ চোষণের মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়'।[৯২]

ইতিহাস দ্বারা জানার উদাহরণ হলো: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

'এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন' *(সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)*।

আয়াতের الْآنَ (এখন) শব্দটি এ হুকুম পরে আসার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে।

অনুরূপভাবে যদি উল্লেখ করা হয় যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পূর্বে কোন বিষয়ে হুকুম দিয়েছেন, তারপর হিজরতের পরে তার বিপরীত ফয়সালা দিয়েছেন, তখন দ্বিতীয়টি 'রহিতকারী' সাব্যস্ত হবে।

(৩) ناسخ নাসিখ বা 'রহিতকারী দলীল' ছ্বহীহ হওয়া: এক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্বান শর্ত করেছেন যে, রহিতকারী দলীল 'রহিতব্য' দলীলের চেয়ে শক্তিশালী অথবা সমমানের হতে হবে। কাজেই তাদের মতে, মুতাওয়াতির হাদীছ খবরে ওয়াহেদ হাদীছ দ্বারা রহিত হবে না। যদিও রহিতকারী দলীলটি ছ্বহীহ হয়।

কিন্তু অধিকতর অগ্রগণ্য মত হলো, نسخ নাসিখ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ناسخ নাসিখ কে অধিকতর শক্তিশালী কিংবা সমমানের হওয়া শর্ত নয়। কেননা, نسخ নাসিখ এর ক্ষেত্র হলো হুকুম আর হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুতাওয়াতির হওয়া শর্ত নয়।

৯২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫২

أقسام النسخ – নাসিখ এর প্রকারভেদ

النسخ নাসিখ তিন প্রকার। যথা:

প্রথম প্রকার: হুকুম মানসূখ বা রহিত হয় কিন্তু তার শব্দ বহাল থাকে। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের نسخ বেশী। এর উদাহরণ হলো: آيتا المصابرة বা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করা সম্পর্কিত আয়াতদ্বয়। আয়াত দু'টি হলো:

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

'যদি তোমাদের মাঝে বিশ জন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে, তবে তারা দু'শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে'*(সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)*।

অত্র আয়াতের হুকুম নিচের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে:

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। আর তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। এতএব, তোমাদের মাঝে একশত জন মুজাহিদ থাকলে, তারা দু'শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে'*(সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)*।

শব্দ রহিত না করে হুকুম রহিত করার হিকমত বা প্রজ্ঞা ও রহস্য হলো: তিলাওয়াতের ছাওয়াব অবশিষ্ট রাখা এবং জাতিকে نسخ এর তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দেয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: শব্দ রহিত হয়, তবে হুকুম বহাল থাকে।

যেমন: রজম (বিবাহিত ব্যভিচারী নর-নারীকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা) বিষয়ক সংশ্লিষ্ট আয়াত।

ছ্বহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে প্রমাণিত যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তন্মধ্যে রজম সংশ্লিষ্ট আয়াত ছিলো। আমরা সেই আয়াত পড়েছি, বুঝেছি ও মুখস্থ করেছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে অনুযায়ী রজম করেছেন। পরবর্তীতে আমরাও রজম করেছি।

উপরন্তু আমার আশংকা হয়, দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেউ হয়তো বলবে, 'আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা তো কুরআনে রজমের আয়াত পাচ্ছি না!' ফলে আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত একটি ফরয বর্জন করার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রজম যথার্থ সেসব নারী-পুরুষের জন্য, যারা বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা গর্ভবতী হয় অথবা স্বীকার করে।

হুকুম রহিত না করে শব্দ রহিত করার হিকমত বা তাৎপর্য হলো, যে আমলের শব্দ কুরআনে পাওয়া যায় না, তদনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে উম্মাহকে পরীক্ষা করা এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে বিষয়ে তাদের ঈমান যাচাই করা। এক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, তারা তাওরাতে রজম সংশ্লিষ্ট نص নছ্ব (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) কে গোপন করার চেষ্টা করেছিলো।

তৃতীয় প্রকার: শব্দ ও হুকুম উভয়টি রহিত হওয়া। যেমন: দশ চোষণ সম্পর্কিত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত পূর্বের হাদীছটি 'রহিত' হওয়া।

ناسخ নাসিখ বা রহিতকারী দলীলের দিক দিয়ে চার প্রকার। যথা:

প্রথম প্রকার: কুরআন দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া। এর উদাহরণ হলো, ধৈর্যের সাথে কাফেরদের মোকাবেলা সম্পর্কিত আয়াতদ্বয়।[৯৩]

দ্বিতীয় প্রকার: হাদীছ দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া। আমি এর স্বপক্ষে ক্রটিমুক্ত কোন দলীল পাইনি।

তৃতীয় প্রকার: কুরআন দ্বারা হাদীছ রহিত হওয়া। উদাহরণ হলো, হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে ছ্বলাত আদায় করার বিধান আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা সাব্যস্ত কা'বার দিকে মুখ করে ছ্বলাত আদায় করার বিষয়ের মাধ্যমে রহিতকরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

'এখন তুমি মাসজিদুল-হারামের দিকে মুখ কর এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১৪৪)*।

৯৩. সূরা আনফাল ৮: ৬৫-৬৬

চতুর্থ প্রকার: এক হাদীছ দ্বারা অপর হাদীছ রহিত করা। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

نَهَيْتُكُم عَنِ النَّبِيذِ فِي هَذه الْأَوعِيَة فَاشْربوا فِيما شئْتُم ولَا تَشْربوا مُسْكرًا

'আমি তোমাদেরকে পানির পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন নাবীয তৈরী করে তা পান করতে পারো। তবে নেশা দ্রব্য কোন কিছু পান করবে না'।[৯৪]

حكمة النسخ –নাসিখ এর হিকমত বা রহস্য:

'রহিতকরণ' এর অনেক হিকমত বা তাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো-

(১) বান্দার দীন-দুনিয়ার জন্য অধিকতর উপকারী শরী'আত প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা।

(২) শরী'আত প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের পন্থা অবলম্বন করা, যাতে তা ক্রমান্বয়ে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে।

(৩) এক হুকুম থেকে পরিবর্তন করে অন্য হুকুম গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারে مكلف মুকাল্লিফ বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের পরীক্ষা করা।

(৪) রহিতকরণ সাধিত হয়ে তুলনামূলক সহজ বিধান আসলে শুকরিয়া আদায় করা এবং তুলনামুলক কঠিন বিধান আসলে তাতে ধৈর্য্য ধারণ করার ব্যাপারে مكلف মুকাল্লিফ বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের পরীক্ষা করা।

৯৪. ছ্বহীহ মুসলিম/৯৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ২১২৯, মুসনাদে আহমাদ (৩/২৩৭/১৩৫১২), আবু ইয়ালা (৬/৩৭৩/৩৭০৭), আল্লামা হায়সামী তার 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ' (৫/৬৬) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীছের সনদে ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ আল জাবির রয়েছে। তাকে অধিকাংশ বিদ্বান দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তার কোন সমস্যা নেই। সনদের অন্যান্য রাবী নির্ভরযোগ্য।

الأخبار -আল খবর বা হাদীছসমূহ

خبر খবর এর সংজ্ঞা: خبر **খবর** এর আভিধানিক অর্থ: সংবাদ দেয়া।

'এখানে খবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কথা, কাজ, অনুমোদন অথবা গুণাগুণ, যা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়'।[৯৫]

কথা বা বাণী সম্পর্কে অনেক বিধি-বিধান ইতিমধ্যে গত হয়েছে। এখন আলোচনা হবে তার কর্ম সম্পর্কে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্ম বিভিন্ন ধরণের:

প্রথম প্রকার: প্রকৃতির চাহিদানুসারে যে কর্ম তিনি পালন করেছেন। যেমন: খাওয়া, পান করা, ঘুমানো প্রভৃতি। এসব কর্মের নিজস্ব কোন হুকুম নেই। তবে কোন কারণবশতঃ এসব আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ হতে পারে। আবার অনেক সময় এর নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিও থাকতে পারে। যেমন: ডান হাতে খাওয়া অথবা নিষিদ্ধ বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে। যেমন: বাম হাতে খাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: অভ্যাসগতভাবে তিনি যা করেছেন। যেমন: পোশাকের বৈশিষ্ট্য। এগুলি মুবাহ বা বৈধ। তবে কারণবশতঃ এগুলি আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার: যেসব কর্ম তিনি নির্দিষ্টভাবে পালন করেছেন। এগুলো কেবল তার জন্যই খাছ/নির্দিষ্ট হবে। যেমন: টানা একাধিক দিন সিয়াম রাখা, কোন মহিলা নিজেকে উৎসর্গ করলে তাকে বিবাহ করা প্রভৃতি।

দলীল ছাড়া কোন কর্মকেই তার জন্য خاص খাছ্ব বা নির্দিষ্ট হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না। কেননা তার কর্মের ব্যাপারে শরী'আতের মূলনীতি হলো তার অনুসরণ করা।

---

৯৫. হাদীছ ও খবর (الحديث، والخبر): উভয়টি সমার্থবোধক। সুতরাং যে কথা বা কাজ বা মৌন সম্মতিকে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্বোধন করা হয় তাকে হাদীছ ও খবর বলা হয়। ইসনাদ ও সনদ (الإسناد، والسند): উভয়টি সমার্থবোধক। সুতরাং মূলহাদীছ পর্যন্ত পৌঁছবার পরম্পরা বর্ণনা সূত্রই হচ্ছে সনদ ও ইসনাদ। মতন (المتن): সনদের পরিসমাপ্তির পরবর্তী কথাই হচ্ছে মতন। (তাওদ্বীহুল আহকাম)

চতুর্থ প্রকার: যা তিনি ইবাদত হিসাবে পালন করেছেন। এক্ষেত্রে তার উপর ওয়াজিব হলো তা পালন করা, যাতে করে আমলটির প্রচার হয়। কেননা, এগুলো প্রচার করা তার উপর ওয়াজিব।

অতঃপর তা পালন করা অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে আমাদের এবং তার জন্য বাঞ্ছনীয়। এটি এজন্য যে, ইবাদত হিসাবে তার কর্ম পালন, কর্মটি শরী'আতসিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে আরো মূলনীতি হলো, তা বর্জন করার জন্য শাস্তি না হওয়া। কাজেই সেটি এমন শরী'আতসিদ্ধ বিষয় হিসাবে গণ্য হবে, যা বর্জনে শাস্তি নেই। এটিই হলো মানদূব (বাঞ্ছনীয়) কর্মের বাস্তব অবস্থা।

এর দৃষ্টান্ত হলো আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত হাদীছ। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি প্রথমে কি করতেন? তিনি বলেন: 'মিসওয়াক করতেন'।[৯৬]

বাড়ীতে প্রবেশের সময় মিসওয়াক করার ব্যাপারে শুধুমাত্র তার কর্মই পাওয়া যায়। কাজেই এটি মানদূব (পালনীয়) হিসাবে গণ্য হবে।

আরো একটি উদাহরণ হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযু করার সময় দাড়ি খিলাল করতেন।[৯৭] আর দাড়ি খিলাল করা চেহারা ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত নয় যে, সেটি ব্যাখ্যাহীন বিষয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য হবে। এটা কেবল তার কর্ম। কাজেই এটি মানদূব হিসাবে গণ্য হবে।

পঞ্চম প্রকার: কুরআন অথবা হাদীছের مجمل মুজমাল বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়ের بيان বাইয়ান বা বাখ্যা হিসাবে যে কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। এমন কাজ পালন করা তার উপর আবশ্যক, যাতে মানুষের নিকট কর্মটির ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়। যেহেতু এমন কর্মের প্রচার করা তার উপর ওয়াজিব।

অতঃপর তার ও আমাদের জন্য এমন কর্মের হুকুম হিসাবে ব্যাখ্যাকৃত نص নছ্ব (কুরআন-হাদীছের ভাষ্য) এর হুকুমই সাব্যস্ত হবে। যদি نص নছ্ব (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) এর হুকুম ওয়াজিব হয়, তাহলে এ কর্মটিও ওয়াজিব হবে। نص নছ্ব (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) এর হুকুম মানদূব হলে, কর্মটির হুকুমও মানদূব হবে। ওয়াজিবের উদাহরণ হলো, ফরয ছ্বলাতের কর্মসমূহ, যা রসূল

৯৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৩

৯৭. তিরমিযী হা/২৯-৩০, ইবনু মাজাহ হা/৪২৯

ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত মুজমাল আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে পালন করেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

'তোমরা ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করো' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)*।

মানদূবের উদাহরণ হলো: বাইতুল্লাহ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে তার দু'রাকাত ছ্বলাত আদায় করা।[৯৮] তার এ ছ্বলাত আদায় কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ

'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে) ছ্বলাতের জায়গা হিসাবে গ্রহণ করো' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১২৫)*।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতটি পাঠ করতে করতে মাকামে ইবরাহীমে আগমন করেছিলেন। এর পিছনে ছ্বলাত আদায় করা সুন্নাত।

কোন কিছুর ব্যাপারে তার স্বীকৃতি, সেটি জায়েয হওয়ার দলীল। তবে সেটি ঐ পদ্ধতিতে জায়েয হবে, যে পদ্ধতির তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন, চাই সেটি কথা হোক বা কর্ম হোক।

কোন কথার উপর তার স্বীকৃতি দেয়ার উদাহরণ হলো: ঐ দাসীর কথাকে স্বীকৃতি দেওয়া, যাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'আল্লাহ কোথায়?' দাসী বলেছিলো, 'আসমানে'।[৯৯]

কোন কর্মের ব্যাপারে তার স্বীকৃতি দেয়ার উদাহরণ: একটি ক্ষুদ্র সেনাদলের সেনাধ্যক্ষের কর্মের স্বীকৃতি। যিনি তার অধীনস্থ ছাহাবীদের নিয়ে ছ্বলাতে কিরা'আত শেষে সূরা ইখলাছ পড়তেন। আল্লাহ তা'আলার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমন করে থাকে?' অতঃপর লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বলেন, যেহেতু সূরাটিতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত বর্ণিত হয়েছে, এজন্যই আমি এটি

৯৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৮

৯৯.ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৭

পড়তে ভালোবাসি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালবাসেন।[১০০]

আরো একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো: হাবশীদের ইসলামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মসজিদে তাদের খেলাধুলা করার স্বীকৃতি দেওয়া।[১০১]

অতঃপর যেসব কর্ম তার যামানায় সংঘটিত হয়েছে অথচ তিনি তা জানেননি, সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকে তার দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। তবে উক্ত কর্মসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সম্মতি থাকার কারণে তা দলীল হিসাবে গণ্য হবে। এজন্য ছাহাবীরা আযল[১০২] জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাদের আযল করার উপর আল্লাহ তা'আলার সম্মতিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আযল করতাম এমতাবস্থায় যে, তখন কুরআন নাযিল হতো'।[১০৩]

ইমাম মুসলিম বর্ধিতভাবে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, যদি এটি নিষিদ্ধ হওয়ার মত কোন বিষয় হতো, তবে কুরআন আমাদেরকে অবশ্যই তা নিষেধ করে দিতো।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সম্মতি রয়েছে তার প্রমাণ হলো, মুনাফিকরা যেসব জঘন্য কর্ম গোপন করতো, আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব কর্মের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, তা জায়েয কর্ম।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কিত 'চারিত্রিক গুণের' দৃষ্টান্ত হলো:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ وأَشْجع النَّاسِ

'রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী দানশীল এবং সবচেয়ে বড় বীর-পুরুষ ছিলেন'।

১০০.ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৭৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮১৩।

১০১.ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৫৪

১০২. আযল হলো স্ত্রীর সাথে যথারীতি মিলন করে বীর্যপাতের ঠিক পূর্বক্ষণে স্ত্রীর যোনী থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো। সাধারণভাবে এ আযল করা মাকরূহ বা নিন্দনীয়। তবে প্রয়োজনীয় অবস্থায় তা জায়েয বলে গণ্য হবে।

১০৩. ছ্বহীহ বুখারী /৫২০৭, ছ্বহীহ মুসলিম /১৪৪০।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কিত আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত হলো নিচের হাদীছ:

كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الناس ليس بالطويل ولا بالقصير

'রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম আকৃতির মানুষ ছিলেন। খুব বেশী লম্বা ছিলেন না; আবার খাঁটোও ছিলেন না'।

খবরকে যাদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাদের বিবেচনায় এর প্রকারভেদ:

খবর যাদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাদের বিবেচনায় খবর তিন প্রকার। যথা:

(১) মারফু: যে খবরকে বাস্তবিকভাবে অথবা হুকুমের দিক থেকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাকে মারফু বলে।

বাস্তবিকভাবে মারফু হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ ও তার অনুমোদন।

হুকুমের দিক থেকে মারফু হলো, যেসব কর্মকে তার সুন্নাতের দিকে অথবা তার যামানার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, যেগুলি সরাসরি তার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর অন্যতম হলো ছাহাবীদের এরকম কথা, 'আমাদের আদেশ করা হয়েছে বা নিষেধ করা হয়েছে' অথবা এ জাতীয় শব্দ বলা। যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কথা,

أُمِرَ النَّاس أَنْ يكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْت، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ

'লোকদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, হাজ্জে তাদের শেষ কর্ম যেন তাওয়াফ করা হয়। তবে তিনি এ বিধানটি ঋতুবতী মহিলাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন'।[১০৪] অনুরূপভাবে উম্মু আতিয়্যার কথা:

نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يعزَمْ عَلَيْنَا

'আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কড়াকড়িভাবে বলা হয়নি'।[১০৫]

১০৪.ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭৫৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২৮।

(২) মাওকুফ: যে হাদীছ ছাহাবীদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয় এবং তার ক্ষেত্রে মারফু-এর হুকুম প্রযোজ্য হয় না, তাকে মাওকুফ হাদীছ বলে। এটি অগ্রগণ্য মতানুসারে দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে এটি যদি কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে কিংবা অপর কোন ছাহাবীর বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তাহলে ভিন্ন হুকুম হবে। কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে বিরোধপূর্ণ হলে কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। আর অন্য ছাহাবীর বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হলে অগ্রাধিকারযোগ্য মতটি গ্রহণ করা হবে।

ছাহাবীর সংজ্ঞা: 'ছাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ঈমান অবস্থায় নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মিলিত হয়েছেন এবং এই অবস্থার উপরই মৃত্যুবরণ করেছেন'।

(৩) মাকতু': যে হাদীছ তাবেঈ বা পরবর্তী কোন ব্যক্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাকে মাকতু' হাদীছ বলা হয়।

তাবেঈ: তাবেঈ ঐ ব্যক্তি, যিনি রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান অবস্থায় ছাহাবীদের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং এ অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

সনদের দিক দিয়ে হাদীছের প্রকারভেদ:

সনদের দিক দিয়ে খবর দু'ভাগে বিভক্ত:

(১) **المتواتر** (খবরে মুতাওয়াতির) (২) **الآحاد** (খবরে আহাদ)।

(১) المتواتر-(খবরে মুতাওয়াতির):[১০৬] ঐ হাদীছকে বলে, যা এতো বিপুল সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেন যে, মানব প্রকৃতি স্বভাবতই তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব মনে করবে এবং তারা এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পন্থায় বর্ণনা করবে। এর উদাহরণ হলো রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

১০৫.ছুহীহ বুখারী হা/১২৭৮, ছুহীহ মুসলিম হা/৯৩৮।

১০৬. মুতাওয়াতির: যে হাদীছ এমন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। সুতরাং মুতাওয়াতির এমন হাদীছকে বলে, যাকে এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, যাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য পোষণ করাকে সাধারণত অসম্ভব মনে করা হয়।

'যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম করে নেয়'।[১০৭]

(২) الآحاد (খবরে আহাদ):[১০৮] মুতাওয়াতির ছাড়া বাকী সবই খবরে আহাদ।

আর মর্যাদাগত দিক দিয়ে খবর তিন প্রকার।[১০৯] যথা :

---

১০৭. ছুহীহ বুখারী হা/১১০, ছুহীহ মুসলিম হা/৪ ভূমিকা।

১০৮. আহাদ হাদীছের সংজ্ঞা: সীমিত ও নির্দিষ্ট সংখ্যক রাবী বা বর্ণনাকারীর মাধ্যমে যে হাদীছ আমাদের নিকট পৌঁছেছে তাকে আহাদ হাদীছ বলে। সুতরাং এটি যখন সাব্যস্ত হবে তখন এর দ্বারা জ্ঞান অর্জন করা যাবে। আহাদ হাদীছের প্রকরণ:

গারীব (غريب) হাদীছ: যে হাদীছকে কোন একক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, সেটাকে গারীব হাদীছ বলা হয়। যদিও বর্ণনাকারীরর সনদের সকল স্তরের কোন এক স্তরে একজন বর্ণনাকারী পরিলক্ষিত হয়।

আযীয (عزيز): যে হাদীছের বর্ণনাকারী সনদের সকল স্তরে দু'জন থেকে কম হবেনা, সেটাকে 'আযীয হাদীছ বলে।

মাশহুর ও মুস্তাফীয (مشهور ومستفيض): এ দু'টি সমার্থবোধক। যে হাদীছকে প্রতিটি স্তরে তিন বা ততোধিক রাবী বর্ণনা করেছে, তবে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেনি, সেটাকে মাশহুর ও মুস্তাফীয হাদীছ বলে।

১০৯. মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) হাদীছ চার প্রকার:

১. ছুহীহ লি-যাতিহী (الصحيح لذاته): (প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ) যে হাদীছের সনদ আমাদের সাথে মিলেছে (এসে পৌঁছেছে) ন্যায়বান, স্মৃতিশক্তিতে প্রখর ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত। আর হাদীছটি শায ও ত্রুটিযুক্তও নয়, সেই হাদীছকে ছুহীহ লি-যাতিহী বলা হয়।

২. ছুহীহ লি-গায়রিহী (الصحيح لغيره): যে হাদীছের সনদে হাসান লি যাতিহীর শর্তসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে, যার রাবীগণের আয়ত্তশক্তি কম এবং একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে সে হাদীছকে ছুহীহ লি-গায়রিহী বলে।

৩. হাসান লি-যাতিহী (الحسن لذاته): যে হাদীছের মধ্যে ছুহীহ লি যাতিহী এর শর্তসমূহ মিলিত হয়েছে, তবে বর্ণনাকারীগণের সংরক্ষণ ক্ষমতায় কিছুটা দুর্বলতা থাকে এবং ঐ সব ত্রুটিকে সম্পূর্ণ করার মত কোন কিছু যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সে হাদীছ হাসান লি যাতিহী বলা হয়।

৪. হাসান লি-গায়রিহী (الحسن لغيره): এটি এমন যঈফ হাদীছ যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং গ্রহণের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে, তাকে হাসান লি-গায়রিহী বলে। (অর্থাৎ যদি কোন

১. الصحيح (ছ্বহীহ)

২. الحسن (হাসান)

৩. الضعيف (দ্বঈফ)

১. الصحيح (ছ্বহীহ): যে হাদীছ ন্যায়নিষ্ঠপূর্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন এবং যা শায[১১০] ও হাদীছের বিশুদ্ধতাকে নষ্টকারী গোপন সূক্ষ্ম দোষ-ক্রটি মুক্ত হয়, তা-ই ছ্বহীহ হাদীছ।

২. الحسن (হাসান): যে হাদীছ ন্যায়নিষ্ঠপূর্ণ হালকা স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন এবং যা শায ও হাদীছের বিশুদ্ধতাকে নষ্টকারী গোপন সূক্ষ্ম দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত হয়, তাকে হাসান হাদীছ বলে। এ ধরনের হাদীছের একাধিক সনদ থাকলে সেটি ছ্বহীহ হাদীছের স্তরে পৌঁছে যায় এবং সেটিকে ' ছ্বহীহ লিগাইরিহী' হিসাবে অভিহিত করা হয়।

৩. الضعيف (দ্বঈফ): যে হাদীছের মধ্যে ছ্বহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে না, তাকে দ্বঈফ হাদীছ বলে। এ ধরনের হাদীছের যখন একাধিক সনদ এমনভাবে থাকে, যার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে, তখন সেটি হাসানের স্তরে পৌঁছে যায়। এটিকে 'হাসান লিগাইরিহী' বলা হয়।

দ্বঈফ হাদীছ ছাড়া বাকী সব ধরনের হাদীছই দলীল হিসাবে গণ্য। দ্বঈফ হাদীছ দলীলযোগ্য নয়। তবে সেগুলোকে অন্য হাদীছের শাহেদ (সমার্থক বর্ণনা) হিসাবে পেশ করাতে কোন দোষ নেই।

যঈফ হাদীছ বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং বর্জনের স্তর হতে গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করে, তখন তাকে হাসান লি-গায়রিহী বলে)।

মারদূদ তথা অগ্রহণযোগ্য হাদীছের প্রকারভেদ: মাকবূল হাদীছসমূহের বিপরীত মারদূদ (অগ্রহণযোগ্য) হাদীছসমূহ। যেসব হাদীছ হাসান হাদীছের শর্তসমূহের মধ্য থেকে এক বা একাধিক শর্ত বিলুপ্ত হওয়ার কারণে হাসান হাদীছের মার্যাদা ও স্তর থেকে নিম্ন স্তরে উপনীত হয়েছে সে সব হাদীছ মারদূদ তথা অগ্রহণযোগ্য হাদীছ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই দুর্বলতা কম ও বেশি দিকে থেকে যঈফের তারতম্য হবে। তাই যঈফ হাদীছ এর অনেক প্রকারভেদ রয়েছে।

১১০.শায হলো কোন নির্ভরযোগ্য রাবী তার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবী অথবা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে বিরোধপূর্ণভাবে হাদীছ বর্ণনা করেন।

হাদীছ বর্ণনা করার ছীগাহ বা শব্দরূপ[১১১]

হাদীছের التحمل-(গ্রহণ করা) ও الأداء (বর্ণনা করা) দু'টি দিক রয়েছে।

التحمل (গ্রহণ করা): হাদীছ অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করাকে التحمل বলে।

الأداء (বর্ণনা করা): হাদীছ অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়াকে الأداء বলে।

হাদীছ অন্যের কাছে বর্ণনা করার কিছু ছীগাহ বা শব্দরূপ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

১. **حدَّثَنِي** (আমাকে বর্ণনা করেছেন): এটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য, যাকে শাইখ নিজে হাদীছ পড়ে শুনিয়েছেন।

২. **أَخْبَرَنِي:** এটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য, যাকে শাইখ হাদীছ পড়ে শুনিয়েছেন অথবা তিনি নিজেই হাদীছটি শাইখকে পড়ে শুনিয়েছেন (শাইখ তাতে সম্মতি দিয়েছেন)।

৩. **أَخْبَرَنِي إجازَةً، أَو أَجازَ لِي** (অনুমতি সূত্রে আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন অথবা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন): এটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য, যিনি শাইখ থেকে হাদীছ অনুমতিসূত্রে বর্ণনা করেন; পঠন-পাঠনের সূত্রে নয়।

الإجازة (অনুমতি): শাইখ যে হাদীছ বর্ণনা করেন, ছাত্রকে ঐ হাদীছ বর্ণনা করার অনুমতি প্রদানই الإجازة। যদিও এটি পঠন-পাঠনের পন্থায় না হয়।

৪. **عَن** : (হতে) শব্দে হাদীছ বর্ণনা করাকে الْعَنْعَنَةُ বলে। এ ধরনের হাদীছের হুকুম হলো, তা মুত্তাছিল হিসাবে গণ্য হবে, তবে মুদাল্লিস রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত। এক্ষেত্রে স্পষ্ট শব্দযোগে হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি বর্ণনা না করা পর্যন্ত এগুলোকে মুত্তাছিল হাদীছের হুকুম দেয়া হবে না।

হাদীছ ও তার রাবী সম্পর্কে 'মুছত্বলাহুল হাদীছ'-এ অনেক প্রকারের আলোচনা রয়েছে। আমরা যতটুকু ইঙ্গিত করলাম, এক্ষেত্রে এতটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

---

১১১. আরো জানতে আমাদের প্রকাশিত 'উসূলে হাদীছ' বইটি পড়ুন।

اَلْإِجْمَاعُ -আল ইজমা

ইজমা এর আভিধানিক অর্থ: দৃঢ় সংকল্প করা, একমত হওয়া। **পারিবাষিক অর্থ:**

اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هٰذه الْأُمَّةِ بعْدَ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حكْمٍ شَرعِيٍ

'ইজমা হল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশার পর শারঈ কোন হুকুমের বিষয়ে এ উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐক্যমত পোষণ করা'।

আমাদের বক্তব্য: **اتفاق** (ঐক্যমত) এ শব্দ দ্বারা মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় আলাদা হয়েছে, যদিও মতানৈক্য একজন বিদ্বানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই কোন বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে ইজমা সংঘঠিত হবে না।

مجتهدي (মুজতাহিদগণ) এ শব্দ দ্বারা সাধারণ মানুষ ও মুকাল্লিদগণ আলাদা হয়েছে। কাজেই সাধারণ মানুষ ও মুকাল্লিদগণের একমত হওয়া বা ভিন্ন মত পোষণ করা ধর্তব্য হবে না।

هذه الأمة (এ উম্মতের) এ অংশ দ্বারা অন্য জাতির ঐক্যমত হওয়া পৃথক হয়েছে। সুতরাং ভিন্ন জাতির ঐক্যমত শরী'আতে ধর্তব্য হবে না।

بعد النبي صلى الله عليه وسلم (রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশার পর) এ অংশ দ্বারা তার জীবদ্দশায় তার (ছাহাবীদের) ঐক্যমত পৃথক হয়েছে। সেগুলো দলীল হওয়ার কারণে ইজমা হিসাবে অভিহিত হবে না। কেননা, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সুন্নাত দ্বারাই দলীল অর্জিত হয়। এজন্য ছাহাবীরা যখন বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এরূপ করতাম অথবা তারা এরূপ করতো। এগুলো হুকুমের দিক থেকে মারফু হাদীছ; 'ইজমার বিবরণ' নয়।

على حكم شرعي (শারঈ কোন হুকুমের বিষয়ে) এ অংশ দ্বারা জ্ঞানগত কিংবা প্রকৃতিগত বিষয়ে ঐকমত্য পৃথক হয়েছে। এখানে এসবের কোন অনুপ্রবেশ নেই। কেননা, এখানে 'ইজমা' শরী'আতের একটি দলীল হিসাবে আলোচ্য।

বেশ কিছু দলীলের ভিত্তিতে ইজমা প্রামাণ্য বিষয় বলে গণ্য। তন্মধ্যে অন্যতম দলীল হলো:

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

'এমনিভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১৪৩)*।

'মানুষের জন্য সাক্ষী হতে পারো' এটি মানুষের কর্মের এবং কর্মের বিধানের সাক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর সাক্ষীর কথা গ্রহণযোগ্য।

২. আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ

'অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হও, তবে আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো' *(সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)*।

আয়াতটি প্রমাণ করে যেসব ব্যাপারে তারা ঐক্যমত পোষণ করেন, তা হক্ব বা সত্য।

৩. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

'আমার উম্মত গোমরাহীর উপর ঐক্যমত পোষণ করবে না'।[১১২]

৪. আমরা বলতে পারি যে, কোন বিষয়ে এ উম্মতের ঐক্যমত পোষণ করা হয়তো হক হবে, না হয় বাতিল হবে। যদি হক হয়, তাহলে সেটি দলীলযোগ্য। আর যদি বাতিল হয়, তাহলে কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান এ উম্মত আল্লাহ তা'আলার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি বাতিল বিষয়ের উপর ঐক্যমত পোষণ করবেন, যে বিষয়ে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন? এটা তো বড়ই অসম্ভব বিষয়!

أنواع الإجماع – ইজমার প্রকারভেদ

ইজমা দু'প্রকার। যথা:

১১২.আবূ দাউদ হা/৪২৫৩, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫০, তিরমিযী/২১৬৭, আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। (তাখরীজুস সুন্নাহ, হাদীছ নং ৮২)

১. القطعي (অকাট্ট ইজমা)

২. الظني (প্রবল ধারণামূলক ইজমা)

১. القطعي (অকাট্ট ইজমা): যে ইজমা উম্মতের পক্ষ হতে অবধারিতভাবে সংঘঠিত হওয়া জানা যায়, তাকে القطعي বা অকাট্ট ইজমা বলে। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয হওয়ার উপর ইজমা, ব্যভিচার হারাম হওয়ার উপর ইজমা প্রভৃতি। এ ধরনের ইজমা সাব্যস্ত হওয়া এবং এর প্রামাণিকতাকে কেউ অস্বীকার করে না। এ ইজমা বিরোধী ব্যক্তি অজ্ঞ না হলে কাফের গণ্য হবে।

২. الظني (প্রবল ধারণামূলক ইজমা): যে ইজমা অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, তাকে الظني ইজমা বলে। এ ধরনের ইজমা সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে অধিকতর অগ্রগণ্য মত হলো শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহর অভিমত। العقيدة الواسطية নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

الْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُم كَثُرَ الاخْتِلَافُ، وَانْتَشَرت الْأُمَّةُ.

‘বিধিবদ্ধ ইজমা সেটাই, যার উপর সালাফে ছালেহীন ছিলেন। কারণ তাদের পরে প্রচুর পরিমাণে মতানৈক্য বৃদ্ধি পায় এবং উম্মাহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে’।[১১৩]

জেনে রাখুন, রহিত নয় এমন সুস্পষ্ট ছ্বহীহ দলীলের বিপক্ষে এ উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করা সম্ভব নয়। কেননা, এ উম্মত কেবল হক্বের উপরই ঐক্যমত পোষণ করতে পারে। কাজেই যখন কোন ইজমাকে দলীলের বিরোধী মনে হবে, সেক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাবে যে, হয়ত দলীলটি ছ্বহীহ নয়, অথবা তা দ্ব্যর্থহীন বা সুস্পষ্ট নয় অথবা সেটি মানসূখ বা রহিত অথবা মাস'আলাটিতে মতানৈক্য রয়েছে, যা আপনি জানেন না।

১১৩. দেখুন, লেখকের শারহুল আক্বীদা ওয়াসীতিয়্যাহ ২/৩২৮।

شروط الإجماع – ইজমা সংঘটিত হওয়ার শর্ত সমূহ

ইজমা সংঘটিত হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো :

১. বিশুদ্ধ পন্থায় ইজমা সাব্যস্ত হওয়া। এটি হতে পারে এভাবে যে, ইজমার বিষয়টি আলেমদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ থাকবে অথবা গভীর জ্ঞানের অধিকারী কোন নির্ভরযোগ্য বিদ্বান ইজমার বিষয়টি বর্ণনা করবেন।

২. তার পূর্বে স্থায়ী কোন মতভেদ থাকবে না। যদি তার পূর্বে এরূপ মতভেদ থাকে, তাহলে সে বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হবে না। কেননা, বিদ্বানদের মৃত্যুর কারণে তাদের অভিমতগুলো বাতিল হয়ে যায় না। সুতরাং ইজমা পূর্বের মতভেদকে উঠিয়ে দেয় না। তবে এটি নতুন করে মতভেদ সৃষ্টি করতে বাধা দেয়। উৎস শক্তিশালী হওয়ার কারণে এ মতটিই অগ্রগণ্য অভিমত।

কেউ কেউ বলেন, ইজমার ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয়। (ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের মতভেদ না থাকা শর্ত নয়) কাজেই একাধিক অভিমতসমূহের মাঝে দ্বিতীয় যুগে এসে যে কোন একটি মতের উপর ইজমা সংঘটিত হতে পারে। ফলে ইজমা পরবর্তীদের উপর দলীল হিসাবে গণ্য হবে।

অধিকাংশ বিদ্বানের মতানুসারে ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমাকারীদের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটা শর্ত নয়। কাজেই কোন যুগের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র তাদের ঐকমত্য পোষণের মাধ্যমে ইজমা সংঘটিত হবে। পরবর্তীতে তাদের জন্য অথবা অন্যদের জন্য তার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নেই। কেননা, যেসব দীলল ইজমার হুজ্জিয়্যাত বা প্রামাণ্যতার উপর প্রমাণ বহন করে, তাতে যুগের পরিসমাপ্তির শর্তের উল্লেখ নেই। উপরন্তু এটি এ কারণে যে, ইজমা তাদের একমত হওয়ার সময়ই সংঘটিত হয়ে যায়। কাজেই পরবর্তীতে কোন জিনিস তাকে উঠিয়ে দিবে?

যখন কোন মুজতাহিদ কোন কথা বলেন অথবা কোন কর্ম করেন এবং তা অন্যান্য মুজতাহিদগণের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করে আর তারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান বা প্রতিবাদ করেন না, তখন সে ব্যাপারে মতভেদ আছে; কেউ বলেন, এটি ইজমা হিসাবে গণ্য হবে। কেউ বলেন, এটি 'হুজ্জত বা প্রামাণ্য' হিসাবে গণ্য হবে; ইজমা হিসাবে নয়। আবার কেউ বলেন, এটি প্রত্যাখ্যান করার আগেই তাদের জীবনকালের পরিসমাপ্তি ঘটলে তা ইজমা হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের যুগের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান না করে অব্যাহতভাবে চুপ থাকা বিষয়টিতে তাদের সহমত পোষণ করার উপর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং এ মতটি সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী অভিমত।

القياس -আল ক্বিয়াস

القياس ক্বিয়াস এর সংজ্ঞা:القياس ক্বিয়াস-এর আভিধানিক অর্থ হলো অনুমান করা, সমান করা। **পারিভাষিক অর্থ:**

تَسوِيَةُ فَرعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لعِلَّة جَامعَة بَينَهما

‘ক্বিয়াস হলো কোন হুকুমের ক্ষেত্রে মূল দলীলের সাথে শাখাগত দলীলকে উভয়ের মাঝে সমন্বয়কারী ইল্লত (হুকুমের কারণ) থাকার কারণে সমান করা’।[১১৪]

الفرع (শাখা): الفرع দ্বারা উদ্দেশ্য, যাকে ক্বিয়াস করা হয়।

الأصل (মূল):الأصل দ্বারা উদ্দেশ্য, যার উপর অন্যকে ক্বিয়াস করা হয়।

الحكم (বিধি-বিধান): الحكم হলো শারঈ দলীল, যা (বিধি-বিধান) দাবী করে। যেমন: ওয়াজিব, হারাম, ছ্বহীহ ও ফাসেদ প্রভৃতি।

العلة হলো: العلة হলো ঐ অন্তর্নিহিত অর্থ, যার কারণে الأصل (মূল)-এর হুকুম সাব্যস্ত হয়।

এ চারটি হলো ক্বিয়াসের রুকন বা ভিত্তি। যেসব দলীলের মাধ্যমে শারঈ হুকুম সাব্যস্ত হয়, তার অন্যতম হলো ক্বিয়াস। এটি শারঈ দলীল হিসাবে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ছাহাবীদের বাচনিক দলীল রয়েছে।

---

১১৪. যেমন: হাদীছে গোবর দিয়ে শৌচকার্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধের কারণ বলা হয়েছে যে, এটি নাপাক *(ছ্বহীহ বুখারী/১৫৬)*। এর উপর কিয়াস করে বলা হয় যে, শুকনা রক্ত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধ। যে হুকুম সরাসরি দলীল দিয়ে সাব্যস্ত হয়, সেটি আসল। যাকে এ আসলের উপর কিয়াস করা হয়, তাকে শাখা বলা হয়। এখানে গোবর দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধের হুকুমটি আসল। শুকনা রক্ত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধের হুকুমটি শাখা। কিয়াস করার জন্য জন্য আসল ও শাখার ইল্লত বা কারণ একই হতে হয়। এখানে গোবর দিয়ে শৌচকার্য করতে নিষেধের কারণ হলো এগুলো নাপাক। এর ভিত্তিতে শুকনা রক্ত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধ হবে; কারণ এখানেও ঐ কারণটি পাওয়া গেছে। কেননা শুকনো রক্তও নাপাক।

কুরআনের দলীলের মধ্যে অন্যতম দলীল হলো:

(১) আল্লাহ তা'আলার বাণী:

اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

'আল্লাহ, যিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি আরও অবতীর্ণ করেছেন ন্যায়দণ্ড' *(সূরা শুরা ৪২:১৭)*।

الْمِيزَانَ (দাঁড়িপাল্লা) হলো যার দ্বারা বিভিন্ন জিনিস ওযন করা হয় এবং সেগুলির মাঝে তুলনা করা হয়।

(২) আল্লাহ তা'আলার বাণী:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ

'যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, সেভাবেই আমি দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবো' *(সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২১৪)*।

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ.

'আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর তদ্বারা সে ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান' *(সূরা ফাতির ৩৫:৯)*।

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীবকে পুনরায় সৃষ্টি করাকে প্রথমবার সৃষ্টি করার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন এবং মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করাকে যমীন জীবিত করার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। এটিই হলো ক্বিয়াস।

সুন্নাহ হতে দলীল হলো-

(১) যে মহিলা তার মা মারা যাওয়ার পর মায়ের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার জবাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম-এর বক্তব্য:

أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟

‘তোমার কি অভিমত, যদি তোমার মায়ের ঋণ থাকে, অতঃপর তা পরিশোধ করো, তবে কি তা আদায় হয়ে যাবে? মহিলা জবাবে বললেন, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন, তাহলে তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করো’।[১১৫]

(২) ‘এক ব্যক্তি এসে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহ তা‘আলার রসূল! আমার একজন কালো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কি উট আছে? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেগুলোর রং কি? লোকটি বললেন, লাল বর্ণের। তিনি বললেন, সেখানে কি ছাই বর্ণের উটও আছে? লোকটি বললেন, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ রং কোথা থেকে আসলো? লোকটি বললেন, হয়তো এটি বংশগত কারণে হয়েছে। এবার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জবাবে বললেন, তাহলে তোমার সন্তানও হয়তো বংশগত কারণে এমন হয়েছে।[১১৬]

কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত এ রকম প্রতিটি দৃষ্টান্তই ক্বিয়াসের প্রমাণ বহন করে। কেননা, এতে কোন জিনিসকে তার সমজাতীয় জিনিসের পর্যায়ভুক্ত করার’ বিষয়টি নিহিত আছে।

ছাহাবীদের বক্তব্য থেকে অন্যতম দলীল হলো, শাসন কার্য ফয়সালার ক্ষেত্রে আবু মুসা আল-আশ‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্দেশ্যে চিঠিতে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,‘... তারপর তোমার বুঝ, যা তোমার কাছে প্রতিভাত হয়, তদনুযায়ী ফয়সালা করবে। যে মাস’আলার ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে কোন দলীল নেই, তা তোমার কাছে পেশ করা হলে তুমি ঐসব মাস’আলাকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ক্বিয়াস বা পারস্পরিক তুলনা করবে এবং উপমা সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে। তারপর তোমার ধারণানুসারে যা আল্লাহ তা‘আলার নিকট অধিকতর প্রিয় এবং হক্বের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তার উপরই নির্ভর করবে।[১১৭]

ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘এটি অত্যন্ত মর্যাদাবান চিঠি, যা উম্মাহ গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইমাম মুযানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ছাহাবীদের যুগ থেকে তার যুগ পর্যন্ত সকল ফক্বীহ একমত যে, ‘নিশ্চয় হক্বের অনুরূপ জিনিসও হক্ব এবং

১১৫.ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৮।

১১৬.ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩০৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০০।

১১৭. বাইহাকী ১০/১১৫, দারাকুৎনী ৪/২০৬-২০৭

বাতিলের অনুরূপ জিনিসও বাতিল হিসাবে বিবেচিত' এবং তারা ফিক্বহের সকল বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ক্বিয়াসের ব্যবহার করেছেন।[১১৮]

شروط القياس – ক্বিয়াস করার শর্তাবলী

ক্বিয়াসের অনেক শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

(১) ক্বিয়াস তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দলীলের সাথে বিরোধপূর্ণ হবে না। কাজেই যে ক্বিয়াস نص বা কুরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল, ইজমা ও ছাহাবীদের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। (যখন আমরা বলি যে, ছাহাবীদের বক্তব্য দলীলযোগ্য)।

সুতরাং যে ক্বিয়াস পূর্বোক্ত দলীলসমূহের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তাকে **فاسد الاعتبار** বা গ্রহণের অযোগ্য ক্বিয়াস হিসাবে অভিহিত করা হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো, প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে, এর উপর ক্বিয়াস করে বলা যে, প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করতে পারবে। এ ক্বিয়াসটি نص (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে **فاسد الاعتبار** বা অগ্রহণযোগ্য। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **لا نكاح الا بولي** 'অভিভাবক ছাড়া কোন বিবাহ নেই'।[১১৯]

(২) মূল দলীলের হুকুমটি نص বা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হতে হবে। সুতরাং যদি মূল হুকুমটি ক্বিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার উপর অন্যকে ক্বিয়াস করা যাবে না। বরং এটিকে প্রথম মূলের উপর ক্বিয়াস করতে হবে। কেননা, সেদিকে ফিরে যাওয়াই উত্তম। কারণ যে বিষয়কে আসল নির্ধারণ করে তার উপর শাখাকে ক্বিয়াস করা হয়, অনেক সময় তা ছ্বহীহ হয় না। এখানে আরো কারণ হলো فرع (শাখা) কে فرع এর উপর ক্বিয়াস করা, অতঃপর সেই فرع কে আবার أصل এর উপর ক্বিয়াস করা কোন উপকার ছাড়াই দীর্ঘসূত্রতা মাত্র।

---

১১৮. ইগাসাতুল লাহফান ১/৮৬

১১৯. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১১০১. আবূ দাউদ হা/২০৮৫, ইবনু মাজাহ হা/১৮৮০

এর দৃষ্টান্ত হলো এটা বলা যে, ভূট্টাতে সূদ প্রযোজ্য হবে চাউলের উপর ক্বিয়াস করে। চাউলে সূদ প্রযোজ্য হয় গমের উপর ক্বিয়াস করে। এভাবে ক্বিয়াস করা শুদ্ধ নয়। বরং এভাবে বলতে হবে যে, ভূট্টাতে সূদ প্রযোজ্য হবে গমের উপর ক্বিয়াস করে। এর কারণ হলো, যাতে نص দ্বারা সাব্যস্ত أصل এর উপর ক্বিয়াস করা যায়।

(৩) أصل এর হুকুমে একটি জ্ঞাত علة থাকতে হবে, যাতে أصل ও فرع এর علة এর মাঝে সমন্বয় করা যায়। যদি মূলের হুকুম কেবল ইবাদত হয়, তাহলে তার উপর অন্য কিছুকে ক্বিয়াস করা যাবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, উটের গোশতের উপর ক্বিয়াস করে এটা বলা যে, উট পাখির গোশত খেলে ওযু ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু উটের সাথে উট পাখির মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে বলা হবে, এ ক্বিয়াস ছ্বহীহ নয়। কারণ মূলের হুকুমের জ্ঞাত কোন কারণ নেই।[১২০] প্রসিদ্ধ মতানুসারে এটা নিরঙ্কুশ ইবাদত।

(৪) হুকুমের সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থকে ইল্লত ধরতে হবে, যার গ্রহণযোগ্যতা শরী'আতের মূলনীতি থেকে জানা যাবে। যেমনঃ মদ হারামের ইল্লত বা কারণ হলো মাতাল হওয়া। ইল্লতের অর্থ যদি দূরবর্তী গুণকে ধারণ করে, যার সাথে হুকুমের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, তাহলে সেটিকে ইল্লত হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে না। যেমনঃ সাদা, কালো প্রভৃতি। এর উদাহরণ হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীছ, যখন বারীরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়, তখন তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে ঐচ্ছিকতা প্রদান করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তার স্বামী কালো দাস ছিলো। এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বক্তব্য 'কালো' একটি দূরবর্তী গুণ; যার সাথে ঐচ্ছিকতা প্রদানের হুকুমের সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। এজন্য কোন দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হলে তার স্বামী যদি দাস হয়, তবে তাকে ঐচ্ছিকতা প্রদান করা হবে, যদিও তার স্বামী ফর্সা হয়। অনুরূপভাবে স্বামী স্বাধীন থাকলে, দাসীকে স্বাধীন করার পরও তার জন্য ঐচ্ছিকতা সাব্যস্ত হবে না, যদিও তার স্বামী কালো হয়।

(৫) أصل এর ন্যায় فرع এর মাঝেও ইল্লত বিদ্যমান থাকা। যেমনঃ বাবা-মাকে 'উহ্' বলা নিষেধের উপর ক্বিয়াস করে বাবা-মাকে প্রহার করা নিষেধ

---

১২০. হাদীছে উটের গোশত খেলে ওযু ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কেন ওযু ভেঙ্গে যায়, এর কোন ইল্লত বা কারণ বর্ণনা করা হয়নি। যেহেতু এর কোন কারণ জানা যায় না, কাজেই এর উপর অন্যকে কিয়াস করা যাবে না। কেননা, কিয়াস করার জন্য শর্ত হলো আসলের হুকুমের ইল্লত জানা থাকতে হবে।

করা। কেননা, উভয়ের ক্ষেত্রে কারণ হলো কষ্ট দেওয়া। কাজেই فرع এর মাঝে ইল্লত পাওয়া না গেলে ক্বিয়াস শুদ্ধ হবে না।

এর দৃষ্টান্ত হলো এরূপ বলা যে, গমের মধ্যে সূদ হারামের কারণ হলো এটি পরিমাপযোগ্য। অতঃপর এটা বলা যে, গমের উপর ক্বিয়াস করে আপেলেও সূদ প্রযোজ্য হবে। এ ক্বিয়াস শুদ্ধ নয়। কারণ فرع এর মাঝে ইল্লত পাওয়া যায়নি। কেননা, আপেল পরিমাপযোগ্য নয়। (বরং ওযন যোগ্য)।

أقسام القياس -ক্বিয়াসের প্রকারভেদ

ক্বিয়াস দু'প্রকারে বিভক্ত। যথা:

১. اَلْجَلِيُّ (সুস্পষ্ট ক্বিয়াস) ২. اَلْخَفِيُّ (অস্পষ্ট ক্বিয়াস)।

১. اَلْجَلِيُّ (সুস্পষ্ট ক্বিয়াস) যে ক্বিয়াসের ক্ষেত্রে علة (কারণ) نص (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) অথবা ইজমার মাধ্যমে জানা যায় অথবা যে কিয়াসে أصل ও فرع এর মাঝে অকাট্যভাবে পার্থক্য না থাকে, তাকে ক্বিয়াসে الجلي বা সুস্পষ্ট ক্বিয়াস বলে।

علة (কারণ) نص নছ্ব (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো, গোবর দ্বারা কুলুখ নেয়া নিষেধের উপর শুকনা-নাপাক রক্ত দ্বারা কুলুখ নেয়া নিষেধের ক্বিয়াস। কেননা, এখানে أصل এর হুকুমের ইল্লত বা কারণ নিম্নোক্ত نص দ্বারা সাব্যস্ত। نص নছ্ব হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দু'টি পাথর ও একটি গোবর (কুলুখ নেওয়ার জন্য) এনেছিলেন। অতঃপর তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন আর গোবর ফেলে দেন এবং বলেন, এটা ركس অর্থাৎ নাপাক।[১২১]

ইল্লত ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচারককে রাগান্বিত অবস্থায় বিচার-ফয়সালা করতে নিষেধ করেছেন।[১২২]

১২১.ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৬

১২২.ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৫৮

রাগান্বিত ব্যক্তির বিচার-ফয়সালা করা নিষেধের উপর ক্বিয়াস করে পেশাব-পায়খানার বেগ প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচার-ফয়সালা করা নিষেধের ক্বিয়াস, قياس جلي এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ أصل এর ইল্লত ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত। আর তা হলো অন্তর ও চিন্তার অস্থিরতা।[১২৩]

أصل ও فرع এর মাঝে অকাট্যভাবে পার্থক্য না থাকার দৃষ্টান্ত হলো, ইয়াতীমের সম্পদ খেয়ে ধ্বংস করা হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করে তার সম্পদ ব্যবহার করে ধ্বংস করা হারাম। কারণ উভয়ের মাঝে অকাট্যভাবে কোন পার্থক্য নেই।

২. **الخفي** (অস্পষ্ট ক্বিয়াস): যে ক্বিয়াস ইল্লত অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে হয় এবং أصل ও فرع এর মাঝে পার্থক্য না থাকার বিষয়টি অকাট্টভাবে বলা যায় না, তাকে قياس خفي বলে। এর উদাহরণ হলো, সূদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে গমের উপর যবক্ষার ক্বিয়াস করা। 'পরিমাপযোগ্য' হওয়ার কারণে উভয়টির সমন্বিত ইল্লত। এখানে 'পরিমাপ যোগ্য' কে ইল্লত বানানো نص বা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত নয় এবং أصل ও فرع এর মাঝে পার্থক্য না থাকার ব্যাপারে অকাট্টভাবে বলা যায় না। কেননা, উভয়ের মাঝে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে, গম খাদ্য দ্রব্য পক্ষান্তরে যবক্ষার খাদ্য দ্রব্য নয়।[১২৪]

قياس الشَّبه (সাদৃশ্যমূলক কিয়াস): ক্বিয়াসের মাঝে আরেকটি হলো قياس الشبه। এটি হলো, যে ক্বিয়াসের فرع ভিন্ন ভিন্ন হুকুম সম্পন্ন দু'টি أصل এর মাঝে দোদুল্যমান থাকে। উভয় أصل এর সাথে উক্ত فرع এর সাদৃশ্যতা রয়েছে। তাই উক্ত فرع কে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ أصل এর সাথে যুক্ত করা হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো, দাসকে স্বাধীন ব্যক্তির উপর ক্বিয়াস করে কোন জিনিসের মালিক বানিয়ে দিলে সে মালিক হবে নাকি চতুষ্পদ প্রাণীর উপর ক্বিয়াস করে মালিক বানিয়ে দিলে মালিক হবে না?

---

১২৩. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার ফায়ছালা করা নিষেধ। কারণ এ সময় মানুষের চিন্তা-চেতনা অস্থির থাকে। এর উপর ক্বিয়াস করে পেশাব-পায়খানার চাপ থাকা অবস্থায়ও বিচার ফায়ছালা করবে না। কেননা, এ অবস্থাতেও মানুষের চিন্তা-চেতনা অস্থির থাকে।

১২৪. الأشنان (যবক্ষার) হলো বালুময় জায়গায় উৎপন্ন এক প্রকার উদ্ভিদ, যেগুলিকে কাপড়, হাত প্রভৃতি ধোয়ার জন্য ক্ষার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

যখন আমরা স্বাধীন ব্যক্তি ও চতুষ্পদ জন্তু এ দু'টি أصل এর দিকে লক্ষ্য করবো, আমরা দেখতে পাবো যে, দাস শব্দটি فرع ও أصل উভয় এর মাঝে দোদুল্যমান। দাস জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, সে তার কর্মের শাস্তি ও ছাওয়াব পায়, সে বিবাহ করে, তালাক দেয় এসব দিক দিয়ে স্বাধীন ব্যক্তির সাথে তার সাদৃশ্যতা রয়েছে। আবার তাকে বিক্রয় করা যায়, বন্ধক রাখা যায়, ওয়াকফ্ করা যায়, দান করা যায় এবং উত্তরাধিকার পণ্য বিবেচিত হয়। সে নিজে কারো ওয়ারিশ হতে পারে না, মূল্যের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়,[১২৫] তাকে ব্যবসার পণ্য বানানো যায়,[১২৬] এসব ক্ষেত্রে সে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথেই তার সাদৃশ্যতা বেশী। সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে চতুষ্পদ প্রাণীর হুকুমের সাথেই যুক্ত করা হবে। এ প্রকারের ক্বিয়াস দুর্বল। কেননা, এখানে দাসের সাথে أصل এর অধিকাংশ হুকুমের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রাখা ছাড়া উপযুক্ত কোন ইল্লত নেই। উপরন্তু ভিন্ন হুকুমের আরো একটি أصل তার সাথে সাংঘর্ষিক রয়েছে।

قياس العكس : ক্বিয়াসের মধ্যে আরো এক ধরনের ক্বিয়াস রয়েছে, যাকে قياس العكس বা বিপরীতধর্মী ক্বিয়াস বলে। এটি হল أصل এর হুকুমের যে ইল্লত রয়েছে, তার বিপরীত ইল্লত فرع এর মাঝে বিদ্যমান থাকার কারণে أصل এর হুকুমের বিপরীত হুকুম فرع এর জন্য সাব্যস্ত করা।

উসূলবিদগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন:

وفي بضْعِ أَحَدِكُمْ صدَقَةٌ، قَالُوا: يا رسولَ الله، أَيَأْتِي أَحدُنَا شَهوتَه ويكُونُ لَهُ فيهَا أَجر؟ قَالَ: أَرَأَيتم لَو وضَعها في حَرام أَكَانَ علَيْه فيها وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَ إذَا وضَعها في الْحَلَال كَانَ لَهُ أَجر

'স্ত্রীর সাথে তোমাদের মেলা-মেশা করাতেও তোমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে। ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করবে,

১২৫. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন দাসকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারী দাসের মালিককে দাসের মূল্য পরিশোধ করবে, যে মূল্য দিয়ে মালিক দাসটি ক্রয় করেছিলেন।

১২৬. কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে, হত্যার বিনিময়ে হত্যা অথবা রক্তমূল্য (একশত উটের সমপরিমাণ মূল্য) পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ তাকে বেচা-কেনা করা যায়।

আর তাতেও তার জন্য ছওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমাদের কি অভিমত, যদি সে এটি হারাম স্থানে ব্যবহার করতো, তবে কি তার পাপ হতো না? (নিশ্চয়ই হতো)। অনুরূপভাবে যখন সে এটাকে হালাল পন্থায় ব্যবহার করবে, তখন তার জন্য ছওয়াব নির্ধারিত হবে।[১২৭]

أصل এর হুকুমের ইল্লতের বিপরীত ইল্লত فرع এর মাঝে পাওয়ার কারণে فرع (অর্থাৎ বৈধ মিলন) এর জন্য أصل (অবৈধ মিলন) এর বিপরীত হুকুম সাব্যস্ত করেছেন। فرع এর জন্য রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাওয়াব সাব্যস্ত করেছেন। যেহেতু এটি বৈধ মিলন। যেমনিভাবে أصل এর জন্য পাপ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এটি অবৈধ মিলন।

التعارض-আত-তা'আরুদ্ব বা পরস্পরবিরোধিতা

التعارض তা'আরুদ্ব এর আভিধানিক অর্থ: একটি অন্যটির বিরোধিতা করা, একে অপরের বাধা সৃষ্টি করা। **পারিভাষিক অর্থ:**

تَقَابُل الدَّلِيلَيْنِ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ

'দু'টি দলীল এমনভাবে মুখোমুখি অবস্থান করা যে, একটি অপরটির সাথে বিরোধপূর্ণ হয়'।

أقسام التعارض أربعة – আত-তা'আরুদ্ব চার প্রকার

প্রথম প্রকার: দু'টি عام 'আম দলীলের মাঝে تعارض তা'আরুদ্ব বা পরস্পরবিরোধিতা। এর ৪টি অবস্থা রয়েছে:

১. উভয়টির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হবে। এটি এভাবে হবে যে, প্রত্যেকটিকে এমন অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে যে, একটি অপরটির সাথে

---

১২৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০০৬

সাংঘর্ষিক হবে না। এক্ষেত্রে সমন্বয় করা ওয়াজিব। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

'নিশ্চয় তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর' *(সূরা আশ-শুরা ৪২:৫২)*। অপর আয়াতে তিনি বলেছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ.

'তুমি যাকে পছন্দ কর, তাকে সৎপথে আনতে পারবে না' *(সূরা আল-ক্বাছাছ ২৮:৫৬)*।

উভয় আয়াতের মাঝে সমন্বয় করা যায় এভাবে যে, প্রথম আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হক্বের পথ প্রদর্শন। এটি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য সাব্যস্ত বিষয়।

দ্বিতীয় আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আমলের তাওফীক্ব দেয়ার হিদায়াত। এটি আল্লাহ তা'আলার হাতে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কেউ এর ক্ষমতা রাখেন না।

২. যদি সমন্বয় করা সম্ভব না নয়, তাহলে কোন দলীল আগে এসেছে আর কোন্ দলীল পরে এসেছে, তার ইতিহাস জানা থাকলে পরের দলীল রহিতকারী সাব্যস্ত হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। প্রথমটি অনুযায়ী আমল করা হবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

'যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে, তা তার জন্য অধিক কল্যাণকর' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১৮৪)*।

অত্র আয়াতটি ছিয়াম পালন করা ও ছিয়াম রাখার বদলে অন্যকে খাদ্য খাওয়ানোর মাঝে ঐচ্ছিকতা প্রদান করার ফায়দা দেয়, সাথে সাথে আয়াতটির মাধ্যমে ছিয়াম পালনের দিক অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কিন্তু পরের আয়াতে বলা হচ্ছে

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

'তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের ছিয়াম রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:১৮৫)*।

এ আয়াতটি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের ছিয়াম পালন করা এবং মুসাফির ও রোগীদের ছিয়াম ক্বাযা করার বিধান নির্দিষ্ট হওয়ার ফায়দা দেয়। কিন্তু এ আয়াতটি প্রথম আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এটি পূর্বের আয়াতটিকে রহিত করে। যেমনটা প্রমাণ করে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত সালামা ইবনে আকওয়ার ছ্বহীহ হাদীছ।[১২৮]

৩. যদি (আগে-পরে বর্ণিত হওয়ার) ইতিহাস জানা না যায়, তাহলে অগ্রগণ্য দলীল অনুসারে আমল করা হবে, যদি সেখানে অগ্রাধিকার দানকারী কোন বিষয় থাকে। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

«مَن مسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتوضَّأْ»

'যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন উযূ করে'।[১২৯]

অপর হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তার উপর কি ওযু আবশ্যক? তিনি বললেন, না। এটি তো তোমারই অঙ্গ বিশেষ।[১৩০]

এখানে প্রথম হাদীছটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা, এতে অধিকতর সতর্কতা রয়েছে। এ হাদীছের সনদ সংখ্যা অনেক। একে ছ্বহীহ আখ্যায়িতকারী মুহাদ্দিছের সংখ্যাও বেশি। উপরন্তু এটি أصل আছ্বল (ওযু ওয়াজিব না হওয়া) সম্পর্কে বিবরণ। তাই এতে অতিরিক্ত ইলম রয়েছে।[১৩১]

৪. যদি অগ্রাধিকার দানকারী কোন বিষয় না পাওয়া যায়, তাহলে সেটিকে মুলতবী রাখা ওয়াজিব। আর এর বিশুদ্ধ কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রকার: দু'টি খাছ দলীলের মাঝে تعارض তা'আরুদ্ব হবে। এটিরও চারটি অবস্থা রয়েছে:

---

১২৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৫০৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৫।

১২৯. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১৮১, তিরমিযী হা/৮২

১৩০. আবূ দাউদ হা/১৮২, তিরমিযী হা/৮৫, ইবনু মাজাহ হা/৪৮৩

১৩১.কোন কিছু করলে ওযু নষ্ট হবে না, এটাই أصل বা মূলনীতি। কাজেই যে হাদীছে বলা হচ্ছে ওযু করতে হবে না, সেটি মূলতঃ উক্ত সাধারণ মূলনীতির উপরই রয়েছে। পক্ষান্তরে যে হাদীছে বলা হচ্ছে ওযু করতে হবে, এটি মূলতঃ উক্ত মূলনীতি সম্পর্কে অতিরিক্ত বর্ণনা দিচ্ছে। কাজেই এই হাদীছে অতিরিক্ত ইলম রয়েছে, বিধায় এটি অগ্রাধিকার পাবে।

১. উভয়টির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হলে সমন্বয় করা ওয়াজিব। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাজ্জের বিবরণ সম্পর্কে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীছ। তিনি বলেছেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة.

'রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের ছ্বলাত মক্কাতে পড়েছেন'।[১৩২]

অপর দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীছে রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাতে যুহরের ছ্বলাত আদায় করেছেন।[১৩৩]

উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা হবে এভাবে যে, তিনি যুহরের ছ্বলাত প্রথমে মক্কাতে পড়েন। এরপর যখন তিনি মিনাতে যান, সেখানকার ছাহাবীদের নিয়ে যুহরের ছ্বলাত পুনঃরায় আদায় করেন।

২. যদি উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইতিহাস জানা থাকলে দ্বিতীয়টি ناسخ নাসিখ বা রহিতকারী সাব্যস্ত হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ...

'হে নবী! তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে তুমি মোহরানা প্রদান কর। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ তোমার আওতাধীন করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোনকে, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে' *(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫০)*।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ .

'এরপর তোমার জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়, যদিও তাদের রূপলাবণ্য তোমাকে মুগ্ধ করে' *(সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫২)*।

---

১৩২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৮

১৩৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩০৯

এক্ষেত্রে এক মতানুসারে দ্বিতীয় আয়াতটি রহিতকারী প্রথম আয়াতকে।

(৩) যদি 'রহিতকরণ' সম্ভব না হয়, তাহলে অগ্রাধিকারযোগ্য দলীল অনুসারে আমল করা হবে, যদি সেখানে অগ্রাধিকার দানকারী কোন বিষয় থাকে।

এর উদাহরণ হলো মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন।[১৩৪]

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীছে রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাইমূনাকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।[১৩৫]

এখানে প্রথম হাদীছটি অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা, মাইমূনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত। কাজেই এসম্পর্কে তিনিই বেশি অবগত।

উপরন্তু তার হাদীছকে আবু রাফে' বর্ণিত হাদীছ শক্তিশালী করে। হাদীছটি হলো, আবু রাফে' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়মূনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। আর আমি উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ছিলাম।[১৩৬]

(৪) যদি (কোন একটি দলীলকে) অগ্রাধিকার দান করে এমন কোন বিষয় না থাকে, তবে উভয় দলীল মুলতবী রাখা ওয়াজিব।

তৃতীয় প্রকার: عام 'আম ও خاص খাছ্ব দলীলের মাঝে تعارض তা'আরুদ্ব হবে। এক্ষেত্রে خاص খাছ্ব দ্বারা عام 'আম কে خاص বা নির্দিষ্ট করা হবে। এর উদাহরণ হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ

'বৃষ্টির পানি দ্বারা যা উৎপন্ন হয়, তাতে এক দশমাংশ উশর দিতে হবে'।[১৩৭] অপর হাদীছে রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১৩৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪১১

১৩৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১১৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪১০

১৩৬. ইবনু হিব্বান হা/১২৭২, তিরমিযী হা/৮৪১, যঈফ আলবানী।

১৩৭. ছ্বহীহ বুখারী/১৪৮৩।

لَيس فيما دون خَمْسَة أَوسق صدقَةٌ

'পাঁচ ওয়াসাক্বের কম ফসলে কোন উশর নেই'।[১৩৮]

এখানে দ্বিতীয় দলীল দ্বারা প্রথমটাকে خاص খাছ্ব বা নির্দিষ্ট করা হবে। কাজেই পাঁচ ওয়াসাক্ব পরিমাণ সম্পদ না হলে তাতে যাকাত ফরয হবে না।

চতুর্থ প্রকার: এমন দু'টি نص এর মাঝে تعارض তা'আরুদ্ব হবে; যার একটি অপরটি থেকে একদিক দিয়ে অধিকতর عام 'আম আবার অপর দিক দিয়ে অধিকতর خاص খাছ্ব। এর তিনটি অবস্থা:

(১) একটির عام 'আম কে অপরটি দ্বারা خاص খাছ্ব করার মর্মে দলীল থাকলে তা দ্বারা خاص খাছ্ব বা নির্দিষ্ট করা হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

'তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন ঐ স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:২৩৪)*। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

'গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত' *(সূরা আত-ত্বালাক্ব ৬৫:৪)*।

প্রথম আয়াতটি ঐ মহিলার সাথে خاص খাছ্ব বা নির্দিষ্ট যার স্বামী মারা গিয়েছে। গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার দিক দিয়ে عام। আবার দ্বিতীয় আয়াতটি গর্ভবতী মহিলার জন্য خاص বা নির্দিষ্ট, তবে স্বামী মারা যাওয়া বা না যাওয়ার দিক দিয়ে عام। কিন্তু প্রথম আয়াতের عام 'আম কে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা خاص খাছ্ব করার মর্মে দলীল রয়েছে।

১৩৮.ছ্বহীহ বুখারী/১৪৮৪, ছ্বহীহ মুসলিম /৯৭৯। উল্লেখ্য যে, এই সম্পর্কে আলোচনা خاص অধ্যায়ে চলে গিয়েছে।

দলীল হলো সুবাই‘আহ আল-আসলামী নাম্নী মহিলা ছাহাবীর স্বামী মারা যাওয়ার কয়েক রাত্র পর তিনি সন্তান প্রসব করেন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন।[১৩৯]

সুতরাং এ ভিত্তিতে গর্ভবতী মহিলার ইদ্দতের সময়সীমা হলো, সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত, চাই তার স্বামী মৃত্যুবরণ করুক অথবা বেঁচে থাক।

(২) যদি একটি عام কে অপরটি দ্বারা خاص করার মর্মে কোন দলীল না থাকে, তাহলে উভয়ের মাঝে অগ্রাধিকারযোগ্য দলীল অনুসারে আমল করা হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন দু’রাক‘আত ছ্বলাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে’।[১৪০] অপর হাদীছে তিনি বলেন,

لَا صلَاة بعد الصُّبح حتَّى تطلع الشَّمس ولَا بعد الْعصرحتَّى تغرب الشَّمس

‘ফজরের ছ্বলাতের পর কোন ছ্বলাত নেই, যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়। আছরের পরও কোন ছ্বলাত নেই, যতক্ষণ না সূর্যাস্ত যায়’।[১৪১]

প্রথম হাদীছটি তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছ্বলাতের সাথে خاص এবং সময়ের ক্ষেত্রে عام। অপর দিকে দ্বিতীয় হাদীছটি সময়ের ক্ষেত্রে خاص কিন্তু ছ্বলাতের ক্ষেত্রে عام যা তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছ্বলাত ও অন্যান্য সব ছ্বলাতকে অন্তর্ভুক্ত করে।[১৪২]

কিন্তু অগ্রগণ্য মত হলো, দ্বিতীয় হাদীছের عام ‘আম কে প্রথম হাদীছ দ্বারা خاص খাছ্ব করা। সুতরাং নিষিদ্ধ সময়ের عام ‘আম ছ্বলাত থেকে خاص খাছ্ব করে তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছ্বলাত আদায় করা জায়েয হবে।

১৩৯.ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩১৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮৫

১৪০.ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭১৪

১৪১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮২৭

১৪২. প্রথম হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু’রাক‘আত ছ্বলাত মসজিদে প্রবেশ করলেই আদায় করতে হবে, তা যে সময়েই প্রবেশ করুক না কেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ফজরের পর ছ্বলাত আদায় নিষেধ, তা যে ছ্বলাতই হোক না কেন।

আমরা এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিলাম। কেননা, তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছ্বলাত ছাড়াও অন্য ছ্বলাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় হাদীছের عام কে خاص করা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন: ফরয ছ্বলাত ক্বাযা করা, পুনঃরায় জামা'আত করা প্রভৃতি। সুতরাং এর عمومية বা ব্যাপকতা দুর্বল বলে গণ্য।[১৪৩]

(৩) যদি (একটি عام কে অপরটি দ্বারা خاص করার মর্মে কোন) দলীল না থাকে এবং একটি عام কে অপরটি দ্বারা خاص করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দানকারী কোন বিষয়ও যদি না থাকে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই বলে ধরা হবে, এ অবস্থায় উভয় দলীল অনুযায়ী আমল করা হবে এবং যে ক্ষেত্রে উভয় দলীল বিরোধপূর্ণ, ঐ অবস্থায় আমল করা স্থগিত রাখা হবে।

কিন্তু সত্তাগতভাবে نص নছ্ব (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) সমূহের মাঝে এধরনের تعارض তা'আরুদ্ব হওয়া সম্ভব নয় যে, তাতে সমন্বয় করা সম্ভব হবে না, রহিত করাও হবে না এবং একটিকে অগ্রাধিকার দেয়াও সম্ভব হবে না। কেননা, نص নছ্ব (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) সমূহ মূলতঃ পরস্পর বিরোধপূর্ণ নয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রচার করেছেন। তবে জ্ঞানের ক্রটির কারণে মুজতাহিদদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনেক সময় এধরনের تعارض তা'আরুদ্ব অনুভূত হয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

১৪৩.অর্থাৎ দ্বিতীয় হাদীছের عام দুর্বল। কেননা, এ হাদীছের عام এর দাবি অনুযায়ী যে কোন ছ্বলাত আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু ফজর ও আছরের পর ক্বাযা ছ্বলাত আদায় করা যায়, দ্বিতীয় জামা'আত করা যায়। সুতরাং এর عام এর দাবি দুর্বল বলে গণ্য। তাই যেহেতু এর عام টি বহাল থাকেনি, সুতরাং এর عام কে অন্য হাদীছ দ্বারা خاص করারও অবকাশ রয়েছে। কেননা, কোন عام কে যখন خاص করা হয়, তখন এ ব্যাপারে কিছু বিদ্বান বলেছেন, ঐ عام আর عام থাকে না। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মত হলো عام দলীল যখন অন্য দলীলের মাধ্যমে خاص হয়, তখন خاص করার পর অবশিষ্ট عام বহাল থাকবে, সমূলে বাদ হয়ে যাবে না। সুতরাং যে ছ্বলাত কোন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেই কারণগুলি যখনই পাওয়া যাবে, তখনই ছ্বলাত আদায় করা যাবে এবং এগুলি দ্বিতীয় হাদীছের عام কে خاص করে দিবে। বাকী অন্যান্য সাধারণ নফল দ্বিতীয় হাদীছের عام নিষেধাজ্ঞার আওতায় নিষিদ্ধ গণ্য হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

الترتيب بين الأدلة-অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে দলীলসমূহের মাঝে স্তর বিন্যাস

কোন হুকুমের ব্যাপারে যখন পূর্বোক্ত দলীলসমূহ (কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াস) এক সাথে আসে অথবা তাদের মধ্যে যে কোন একটি দলীল আসে এবং তার বিরোধী কোন দলীল না আসে, তখন সেই হুকুম সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। আর যদি দলীলগুলো পরস্পরে বিরোধপূর্ণ হয়, তবে তাদের মাঝে যদি সমন্বয় করা সম্ভব হয়, সমন্বয় করা আবশ্যক। সমন্বয় করা সম্ভব না হলে 'রহিতকরণ' এর মাধ্যমে আমল করা হবে, যদি তার শর্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

'রহিতকরণ' সাব্যস্ত করা সম্ভব না হলে, এর কোন একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে-

(১) কুরআন সুন্নাহর نص (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) কে ظاهر এর উপর

(২) ظاهر কে مؤول এর উপর

(৩) منطوق (বাচনিক) কে مفهوم (বোধগম্যতা) এর উপর

(৪) مثبت (হ্যাঁ-বাচক) কে نافي (না-বাচক) এর উপর

(৫) أصل সম্পর্কে বর্ণনা দানকারী যা أصل এর উপর বহাল রয়েছে- তার উপর

(৬) সংরক্ষিত عام কে (যে عام কে কোনভাবেই خاص করা হয়নি) অসংরক্ষিত عام (যে عام কে অন্য কোনভাবে خاص করা হয়েছে) এর উপর

(৭) যার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য বেশি রয়েছে, তাকে কম বৈশিষ্ট্য সম্পন্নের উপর

(৮) ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনাকে যিনি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নন, তার বর্ণনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে

(৯) ক্বিয়াসের মধ্যে قياس جلي কে قياس خفي এর উপর

(১০) ইজমার মধ্যে قطعي ইজমাকে ظني ইজমার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

المفتي والمستفتي-মুফতী ও ফাতাওয়া প্রার্থী প্রসঙ্গে

المفتي (ফাতাওয়া দানকারী): মুফতি হলেন শরী'আতের কোন হুকুম সম্পর্কে সংবাদ দানকারী।

المستفتي (ফাতাওয়া প্রার্থী): শরী'আতের কোন হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী ব্যক্তিকে **المستفتي** (ফাতাওয়া প্রার্থী) বলে।

شروط الفتوى – ফাতাওয়ার শর্তাবলী

ফাতাওয়া প্রদান জায়েয হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো-

(১) মুফতীকে শারঈ হুকুমটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত থাকতে হবে অথবা অগ্রাধিকারযোগ্য প্রবল ধারণা থাকতে হবে। অন্যথায় তার জন্য আবশ্যক হলো ফাতাওয়া প্রদান স্থগিত রাখা।

(২) প্রশ্নটি নিয়ে পরিপূর্ণভাবে চিন্তা করে দেখা, যাতে করে তিনি ঐ ব্যাপারে শারঈ হুকুম বলতে সমর্থ হন। কেননা, কোন কিছু সম্পর্কে হুকুম দেয়া বিষয়টি ভালোভাবে বুঝার অংশ বিশেষ।

ফাতাওয়া প্রার্থীর কথার অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে, তাকে জিজ্ঞেস করে নিবেন। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যা জেনে নিবেন অথবা বিস্তারিত জবাব দিবেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি কন্যা, ভাই ও আপন চাচা রেখে মারা গেছেন। এক্ষেত্রে মুফতী জিজ্ঞেস করে নিবেন ভাই সম্পর্কে যে, ভাই বৈপিত্রীয় কি না? অথবা বিস্তারিত জবাব দিবেন। তা এভাবে যে, ভাই যদি বৈপিত্রীয় হয়, তাহলে উত্তরাধিকার সম্পদে তার কোন অংশ নেই। কন্যার নির্ধারিত অংশ (সম্পদের অর্ধাংশ) দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ চাচার জন্য হবে। আর ভাই যদি বৈপিত্রীয় না হয় (বরং বৈমাত্রেয় বা সহদর হয়) তাহলে কন্যার নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর বাকী সম্পদ ভাই পাবে এবং চাচা কোন অংশ পাবে না।

(৩) মুফতীকে শান্ত থাকতে হবে, যাতে মাসআলাটি অনুধাবন করে শারঈ দলীলের সাথে সমন্বয় করতে পারেন। তাই রাগ, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি প্রভৃতি কারণে চিন্তাগত অস্থির অবস্থায় ফাতওয়া প্রদান করবেন না। ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো-

(ক) জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বাস্তবতা থাকা। তাই যদি জিজ্ঞাসিত বিষয়টির বাস্তবতা না থাকে, তাহলে প্রয়োজন না থাকার কারণে ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে না। তবে যদি প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য শিক্ষা লাভ করা হয়, তাহলে ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কেননা, জ্ঞান গোপন করা জায়েয নেই। বরং সর্বাবস্থায় যখনই প্রশ্ন করা হবে, তখনই উত্তর প্রদান করবেন।

(খ) প্রশ্নকারীর এরকম অবস্থা না জানা যে, তার উদ্দেশ্য হলো, একগুয়েমী করা অথবা সুযোগ সন্ধান করা অথবা আলেমদের মতামতকে পরস্পরের বিপক্ষে পেশ করা প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্য। যদি প্রশ্নকারীর অবস্থা এরূপ জানা যায়, তাহলে ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে না।

(গ) ফাতাওয়া প্রদানের ফলে তুলনামূলক বেশি ক্ষতিকর জিনিস সাব্যস্ত হবে না। যদি এধরনের অবস্থা হয়, তাহলে ফাতাওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, যাতে অল্প ক্ষতিকর জিনিসের মাধ্যমে অধিক ক্ষতিকর জিনিস প্রতিহত হয়।

يلزم المستفتي أمران – ফাতাওয়া প্রার্থীর জন্য যা আবশ্যক

ফাতাওয়া প্রার্থীর জন্য বেশ কিছু জিনিস আবশ্যক। যথা:

প্রথম: ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হবে হক্ব জানা ও তদনুযায়ী আমল করা। সুযোগ সন্ধানী ও মুফতীকে প্রশ্নবিদ্ধ করা প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্যে নয়।

দ্বিতীয়: যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় জানেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকেই কেবল ফাতাওয়া গ্রহণ করতে হবে অথবা যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা আছে যে, তিনি জ্ঞানগত দিক থেকে ও আল্লাহভীরুতার ক্ষেত্রে তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য মুফতী, ফাতাওয়া প্রদানের যোগ্য, তাহলে তার নিকট থেকেই ফাতাওয়া গ্রহণ করা উচিত হবে। কেউ কেউ এভাবে বেছে নেয়াকে আবশ্যক বলেছেন।

তৃতীয়: তিনি প্রশ্নকারীর অবস্থা বাস্তবতার আলোকে সূক্ষ্মভাবে বিবরণ দিবেন। যেমন: প্রশ্নকারী এভাবে বলবে যে, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। আমরা সাথে অল্প কিছু পানি বহন করে নিয়ে যাই, তা দিয়ে ওযু করলে আমরা পিপাসিত হই। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করতে পারবো?

চতুর্থ: মুফতী জবাবে যা বলবেন, প্রশ্নকারী তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। এমনকি জবাব পরিপূর্ণভাবে না বুঝে চলে যাবেন না।

الاجتهاد-ইজতিহাদ

اجتهاد এর সংজ্ঞা: اجتهاد এর আভিধানিক অর্থ: কষ্টকর কোন কিছু পাওয়ার জন্য চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। পারিভাষিক অর্থ:

بَذْلُ الجُهْدِ لِإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

'শারঈ কোন হুকুম জানার জন্য চেষ্টা নিয়োজিত করাকে ইজতিহাদ বলে। যিনি এ ধরনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন, তাকে মুজতাহিদ বলে।[১৪৪]

شروط الاجتهاد – ইজতিহাদ করার শর্তাবলী

ইজতিহাদ করার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে:[১৪৫]

---

১৪৪. মাস'আলা উদ্ঘাটন পদ্ধতির ভিত্তিতে শারঈ আমলীয় কোন হুকুম জানার জন্য ফক্বীহ-মুজতাহিদের চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত থাকাই হলো ইজতেহাদ। এখানে চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত থাকার অর্থ হলো শারঈ হুকুম জানার জন্য সাধ্যানুসারে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছা। বেশি বেশি অন্বেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে দৃঢ় উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। অবশ্য যিনি শারঈ হুকুম অনুসন্ধান করবেন তার ফক্বীহ হওয়া আবশ্যক। কেননা, ফক্বীহ ব্যতিরেকে অন্য কেউ শারঈ হুকুম কেন্দ্রীক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারে না। ফক্বীহ ব্যতীত কোন ব্যক্তির চেষ্টা ইজতেহাদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাকে মুজতাহিদ বলা যাবে না। যেমন: কেউ যদি চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন না করেই কোন নির্দিষ্ট রোগীর আভ্যন্তরীণ রোগ বুঝার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা দিতে চায় তাহলে তার পক্ষে এটা ঠিক হবে না।

১৪৫. উছুলবিদগণ মুজতাহিদ হওয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। ঐ শর্তসমূহ পূর্ণ হলেই মুজতাহিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিম্নে সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

প্রথম: কিতাবের ভাষা জানতে হবে এবং একক, যৌগিক ও নির্দিষ্ট শাব্দিক অর্থগত জ্ঞান থাকতে হবে। আর শাব্দিক তথ্য জ্ঞান, ইলমুছ ছরফ, নাহু, ইলমুল বায়ান, মা'আনী ইত্যাদি ব্যাকরণগত নিয়ম-পদ্ধতি জেনে নেয়ার মাধ্যমে আরবী ভাষা উত্তমরূপে চর্চা করতে হবে।

দ্বিতীয়: সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। তথা সরাসরি হাদীছের মতন বুঝতে হবে এবং আমাদের নিকট হাদীছ পৌঁছার সনদ সম্পর্কিত পদ্ধতি বুঝতে হবে। ইলমুল জারাহ ও তা'দীল জেনে বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশস্ত ইমামগণের ন্যায়পরায়ণতা যথোপযুক্ত বলে বিবেচিত। যেমন: ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) এবং সুনানে কুবরার অন্যান্য ইমাম।

তৃতীয়: আম-খাছ, মুতলাক্ব-মুক্বাইয়াদ, মুজমাল-মুবাইয়ান, নাসিখ-মানসুখ, সমতা বিধানের পদ্ধতি এবং যে নছে বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ্ব আছে তা নিরসনে অগ্রগণ্য পদ্ধতি জেনে উছুলে ফিক্বহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদী মুজতাহিদকে জানতে

(১) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শারঈ জ্ঞান থানা। যেমনঃ বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত ও হাদীছসমূহ জানা।

(২) হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান থাকা। যেমনঃ সনদ, রিজাল প্রভৃতি সম্পর্কে জানা।

(৩) নাসেখ, মানসূখ ও ইজমা সংঘটিত হওয়ার স্থান সম্পর্কে জানা, যাতে করে ইজমা বিরোধী অথবা মানসূখ দলীল অনুযায়ী কোন হুকুম না দেন।

(৪) যেসব দলীলের মাধ্যমে হুকুম ভিন্ন হয়ে যায়, তা জানা। যেমনঃ خاص করা। শর্তযুক্ত করা প্রভৃতি, যাতে করে এসবের দাবী বিরোধী কোন হুকুম না দেন।

(৫) অভিধান ও উসূলে ফিক্বহের মধ্যে যেগুলি শব্দের মর্মার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট তা জানা থাকা। যেমনঃ **عام، خاص، مطلق، مقيد، مجمل، مبين** প্রভৃতি, যাতে এগুলোর মর্মার্থের দাবী অনুসারে হুকুম দিতে পারেন।

(৬) দলীল থেকে বিধি-বিধান বের করার যোগ্যতা থাকা।

ইজতিহাদ কখনও খণ্ডিত হয়। তাই ইজতিহাদ ইলমের যে কোন একটি অধ্যায় কিংবা যে কোন একটি মাসআলায় হতে পারে।[১৪৬]

হবে। আর উছূলের কিতাব সম্পর্কে স্পষ্ট দক্ষতা থাকতে হবে। যদি কোন আলিমের মাঝে এ শর্তসমূহের পূর্ণতা দেখা যায় এবং আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে কিতাব-সুন্নাহের নছ সম্পর্কে সঠিক বুঝ দান করেন, ঐ মুজতাহিদ আল্লাহর তা'আলার সাহায্য কামনা করেন, বেশি বেশি চিন্তা-গবেষণা, পর্যালোচনা করেন, পূর্ববর্তী ও অগ্রগণ্য আলিমগণের শরনাপন্ন হন তাহলেই আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে ইজতেহাদের জ্ঞানার্জনের তাওফীক্ব দিবেন। আমরা একটা ভুল কথা শুনে থাকি তাহলো কেউ বলেন, ইজতেহাদের দরজা বন্ধ। আসলে কথাটি ঠিক নয় বরং ইজতেহাদের দরজা খোলা। তবে হ্যাঁ, ইজতেহাদের দরজা খোলা থাকার সীমারেখা আছে। যেমনঃ আমরা এমন কিছু অজ্ঞ যুবকদের মাঝে ভুল দেখতে পাই যারা প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ব্যতিরেকেই নিজেকে আশঙ্কাযুক্ত ক্ষেত্রে জড়িত করে। আল্লাহ তা'আলার নিকট সকলের জন্য হেদায়াত কামনা করছি। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পরিবার বর্গ ও ছাহাবীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তাওদ্বীহুল আহকাম

১৪৬. যদি কোন ব্যক্তির শরী'আতের সামগ্রিক জ্ঞান না থাকে, কিন্তু কোন একটি মাসআলায় তার ভালো দখল থাকে, মাসআলা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দলীল-প্রমাণাদি তার কাছে থাকে তবে সে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে ইজতিহাদ করার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

ما يلزم المجتهد – মুজতাহিদের জন্য যা আবশ্যক

মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক হলো, হক্ব জানার ক্ষেত্রে তার সর্বাত্মক চেষ্টা নিয়োজিত করা।[১৪৭] তার কাছে যা সত্যরূপে প্রতীয়মান হবে, তদনুযায়ী তিনি

---

১৪৭. ফিক্বহী মাসআলায় মতানৈক্য অথবা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমাদের করণীয়। কারণ ফিক্বহী বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমানেও চালু আছে, এটা কি নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য? জবাব হলো, মতভেদ দু'প্রকার:

প্রথমত: দীনি বিষয়ে মতভেদ। যেমন ইবাদত ও আক্বীদায় মতানৈক্য। এধরণের মতানৈক্য নিকৃষ্ট ও হারাম। কেননা দীনে (ইবাদত ও আক্বীদায়) ইজতিহাদ করার কোন অবকাশ নেই, রায় বা সিদ্ধান্ত দেয়ারও কোন সুযোগ নেই। বরং দীন ও আক্বীদা পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার কোন বিধান নেই।

আল্লাহ তা'আলা দীন ও আক্বীদা হিসাবে যা কিছু আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, রায় ও ইজতিহাদ ছাড়াই তা আঁকড়ে ধরা আমাদের উপর ওয়াজীব-আবশ্যক। আর ইবাদতও পরিপূর্ণ। যে বিষয়ে দলীল রয়েছে তা আমাদেরকে জানতে হবে। আর যে বিষয়ে দলীল পাওয়া যায় না তা বিদ'আত বলে গণ্য, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন হাদীছে বর্ণিত আছে,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

যে আমাদের দীনে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যা দীন নয় তা প্রত্যাখ্যাত। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮। অন্য হাদীছে এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

তোমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করা হতে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুনত্ব বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামের কারণ। ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/১৫৭৭

সাধারণভাবে আক্বীদা, ইবাদত ও দীনি বিষয়ে কখনো মতানৈক্যের কোন সুযোগ নেই। একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান ও সালাফদের পদ্ধতিই অনুসরণীয়।

দ্বিতীয়: রায় (সিদ্ধান্ত) এর ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে অথবা ফিক্বহী মাসআলায় ইজতিহাদী ব্যাখ্যার বিষয়ে ও দলীলের ভিত্তিতে বিধান উদ্‌ঘাটন করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে। কেননা মানুষকে বুঝানোর ক্ষেত্রে বিধান উদ্‌ঘাটনে ভিন্নতা আসতে পারে।

আর ইজমার মাসআলাসমূহ সীমাবদ্ধ, তাতে মতানৈক্য বৈধ নয়। যে সব ইজতিহাদী মাসআলায় ইজমা হয়নি, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করার সুযোগ আছে। প্রত্যেক বিদ্বানকে আল্লাহ তা'আলা উপযোগী জ্ঞান ও বুঝ দান করেন, যাতে তারা দলীল উদ্‌ঘাটন করতে পারে। এক্ষেত্রে ইজতিহাদ শরী'আত সম্মত।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যে ইজতিহাদ হতো তা ছিল কল্যাণকর। এসব ইজতিহাদী বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তবে দীন ও আক্বীদাগত বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। আর ফিক্বহী মাসআলায় মতানৈক্য ঘটেই থাকে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে

হুকুম দিবেন। এতে যদি তিনি সঠিকতায় পৌঁছেন, তাহলে তার জন্য দু'টি ছ্বওয়াব রয়েছে। একটি ছ্বওয়াব চেষ্টা করার কারণে, আরেকটি ছ্বওয়াব হক্ব পাওয়ার কারণে। কেননা, হক্ব প্রাপ্তির মাঝে রয়েছে হক্বকে প্রকাশ করা ও তদনুযায়ী আমল করা। আর যদি তিনি ভুল করেন, তবুও তার জন্য একটি ছ্বওয়াব রয়েছে এবং ভুলটি ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

إِذَا حكَم الْحَاكِمُ فَاجتهد فأَصاب فَلَهَ أَجْرَان وإِذَاحكَم فَاجتهد فَأَخْطَأَ فَلَهَ أَجر

'যখন কোন বিচারক ইজতিহাদ করে ফায়ছালা দেন। অতঃপর তিনি ফায়ছালায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য দু'টি ছ্বওয়াব রয়েছে। আর ইজতিহাদ করার পরও ভুল করলে তার জন্য একটি ছ্বওয়াব রয়েছে'।[১৪৮]

যদি তার নিকট সত্য স্পষ্ট না হয়, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো এ ব্যাপারে ইজতিহাদ স্থগিত রাখা। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্যের তাক্বলীদ করাও তার জন্য বিধেয় হবে।

التقليد-তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ)[১৪৯]

ছাহাবীরা ইজতিহাদ করতেন আর তাতে মতানৈক্য হতো। (শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান)

১৪৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৬

১৪৯. জাহিলী সমস্যার মধ্যে একটি হলো: [التقليد] অন্ধ অনুসরণ করা। তা জাহিলদের পরস্পরের মাঝে কতিপয়ের অনুকরণ করা বুঝায়। যদিও অনুসৃত ব্যক্তিরা আদর্শবান নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: ٢٣]

আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলেছে, নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি তাই আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি (*সূরা আয যুখরুফ ৪৩:২৩*)। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

التقليد এর সংজ্ঞা: **التقليد** এর আভিধানিক অর্থ- ঘাড়ে কোন কিছু বেষ্টন করে দেয়া। যেমন: মালা। পরিভাষায়:

اتّبَاعُ من لَيس قَولُه حجَّةً

'যার কথা শরী'আতে হুজ্জাত বা দলীল নয়, তাকে অনুসরণ করাকে তাক্বলীদ বলে'।

আমাদের বক্তব্য: **من ليس قوله حجة** (যার কথা শরী'আতে হুজ্জত বা দলীল নয়) কথাটির অন্তর্ভুক্ত হবে না, যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইজমা ও ছাহাবীদের অনুসরণ করা হবে। কারণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইজমা ও ছাহাবীদের অনুসরণ করা দলীল হিসাবে গণ্য। তাদের অনুসরণকে তাক্বলীদ হিসাবে ধরা হবে না। কেননা, তাদের অনুসরণ করা বলতে দলীলের অনুসরণ করাই বুঝায়। তবে কোন কোন সময় রূপকভাবে এবং ব্যাপকতার দিক বিবেচনা করে তাদের অনুসরণকেও তাক্বলীদ হিসাবে ধরা হয়।

{إنَّا وجَدْنَا آباءَنا علَى أُمَّةٍ} [الزخرف: ٢٣]

নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি (*সূরা যুখরুফ ৪৩:২৩*)।

অর্থাৎ জাহিলরা তাদের পূর্ব পুরুষদের আদর্শ ও দীনের অনুসারী। তারা রসূলগণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলে। তাদের ধারণা এটা রসূলগণের আনুগত্য থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। এটা [**التقليد الأعمى**] আত-তাক্বলিদুল'আমা বা অন্ধ অনুসরণ এবং [**أمور الجاهلية**] উমুরুল জাহিলীয়া বা জাহিলী কর্ম। ভালকাজের অনুকরণ করার নাম [**اتباعاً واقتداء**] ইত্তেবা ও ইক্বতেদা তথা অনুসরণ ও অনুকরণ। আল্লাহ তা'আলা ইউসূফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

{واتَّبعْتُ ملَّةَ آبائي إبرَاهيم وإسْحاقَ ويعقُوبَ ما كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ باللَّه منْ شَيْء} [يوسف: ٣٨]

আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয় (*সূরা ইউসূফ ১২:৩৮*)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من الْمهَاجِرِينَ والْأَنْصَارِ والَّذين اتَّبعُوهُمْ بإحْسَانٍ} [٩:١٠٠]

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে *(সূরা আত তাওবা ৯:১০০)।* (শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওয়ান)

مواضع التقليد – তাক্বলীদ করার ক্ষেত্রসমূহ

দু'ক্ষেত্রে তাক্বলীদ করা হয়-

প্রথম: মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসরণকারী) একেবারেই সাধারণ মানুষ, যিনি নিজে নিজে শারঈ হুকুম জানতে পারেন না। সুতরাং তার জন্য আবশ্যক হলো তাক্বলীদ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও' *(সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩)*।

এ ব্যাপারে তিনি ইলম ও আল্লাহভীরুতার দিক দিয়ে যাকে শ্রেষ্ঠ পাবেন, তার অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে যদি দু'জন ব্যক্তি সমপর্যায়ের হন, তাহলে তাদের যে কারো অনুসরণ করার মাঝে তার স্বাধীনতা থাকবে।

দ্বিতীয়: মুজতাহিদের নিকট এমন কিছু ঘটবে, তাৎক্ষণিকভাবে যার সমাধান করতে হবে, যখন তার চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ থাকে না, এমতাবস্থায় অন্যের তাক্বলীদ করা বিধেয় হবে।

তাক্বলীদ জায়েয হওয়ার জন্য কেউ কেউ এটাও শর্ত করেছেন যে, বিষয়টি দীনের এমন মৌলিক বিষয়ে হবে না, যাতে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। কেননা, আক্বীদাগত বিষয়সমূহের ব্যাপারে ব্যক্তিকে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হয় অথচ তাক্বলীদ শুধুমাত্র প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হয়। তবে অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত হলো, এটা শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও' *(সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩)*।

আয়াতটি রিসালাতকে সাব্যস্ত করার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে অথচ রিসালাত দীনের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু সাধারণ মানুষ দলীলের মাধ্যমে হক্ব জানতে সক্ষম হয় না। তাই যখন নিজে নিজে হক্ব জানা অসম্ভব হবে, তখন তাক্বলীদ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

‘তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুসারে আল্লাহকে ভয় করো’ *(সূরা আত-ত্বাগাবুন ৬৪:১৬)*।

أنواع التقليد – তাক্বলীদের প্রকারভেদ

তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) দু’প্রকার:

১. **العام** (ব্যাপক তাক্বলীদ)

২. **الخاص** (নির্দিষ্ট তাক্বলীদ)

(ক) العام (ব্যাপক তাক্বলীদ): তাক্বলীদে ‘আম বা ব্যাপক তাক্বলীদ হলো, নির্দিষ্ট একটি মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা, দীনের সব বিষয়ে মুকাল্লিদ উক্ত মাযহাবের রুখছাত (নমনীয়-সাধারণ) ও আযীমাত (শরী‘আতের আবশ্যিক) গুলো গ্রহণ করে।[১৫০]

এ তাক্বলীদের ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। পরবর্তী লোকদের দ্বারা ইজতিহাদ করা সম্ভবপর না হবার কারণে কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন।[১৫১]

আবার কতিপয় বিদ্বান এটাকে হারাম বলেছেন-যেহেতু এতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যের অনুসরণের ক্ষেত্রে শর্তহীন বাধ্য-বাধকতা রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

"إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلي الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه"...

---

১৫০. রুখছাত হলো ছাড়মূলক ফাতাওয়া। যেমন: হানাফী মাযহাব মতে, উটের গোশত খেলে ওযু করা লাগে না। আযিমাত হলো অবশ্য পালনীয় বিষয়। যেমন: হাম্বলী মাযহাব মতে, উটের গোশত খেলে ওযু ভেঙ্গে যায়। পরে ছ্বলাত আদায় করতে চাইলে নতুন করে ওযু করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি তার অনুসরণীয় মাযহাবের সব রুখছাত ও আযীমাত গ্রহণ করে।

১৫১. এটা খুবই বাজে মত। কেননা, কুরআন-হাদীছের নছ বহাল থাকার পরেও, পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে তাকলীদ অবধারিত করে দেয়া মোটেও সঠিক কথা নয়।

'আল্লাহ তা'আলার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কারো আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা আবশ্যকতার মতটি ইজমা বিরোধী। এটি জায়েয হওয়ার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।[১৫২]

তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে আঁকড়ে ধরে, অতঃপর উক্ত মাযহাবের বিপরীত কোন আমল করে, কোন কারণ ছাড়াই অন্য কোন আলিমের ফাতাওয়ার কারণে ঐ মাযহাবের অনুসরণ করেছে এমন নয়, মাযহাবের বিপরীত আমলের দাবি রাখে এমন কোন দলীলও তার কাছে নেই অথবা তার কর্মের বৈধতা দাবি করে এমন কোন শারঈ ওযরও নেই, তবে সে ব্যক্তি শারঈ কোন ওযর ছাড়াই হারাম সম্পাদনকারী ও তার প্রবৃত্তির পূজারী হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি অবশ্যই গর্হিত কর্ম।

কিন্তু যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় এমন বিষয়, যা এক মতের উপর আরেক মতকে অগ্রাধিকার দেয়াকে অবধারিত করে, এটি হতে পারে বিস্তারিত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে, যদি সে উক্ত দলীল-প্রমাণ জানতে ও বুঝতে পারে অথবা দু'জনের মধ্যে একজনকে উক্ত মাসআলার বিষয়ে অধিক জ্ঞাত মনে করে এবং সে ব্যক্তি তার বক্তব্যের ব্যাপারে আল্লাহকে অধিক ভয় করে, এমতাবস্থায় সে যদি এক অভিমত থেকে অন্য অভিমতের দিকে ফিরে যায়, তবে এটি জায়েয। বরং ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।[১৫৩]

২. الخاص **খাছ্ব (নির্দিষ্ট তাক্বলীদ):** নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করাকে তাক্বলীদে خاص **খাছ্ব** বলে। যখন কোন ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে হক্ব জানতে অপারগ হবে, তখন এটি জায়েয। চাই সে ইজতিহাদ করতে প্রকৃত অর্থেই অপারগ হোক অথবা খুব কষ্ট করে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হোক।

---

১৫২. ফাতাওয়া আল কুবরা ৪/৬২৫

১৫৩.শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া (رحمه الله) এর বক্তব্য অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এজন্য বলা হয় যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া (رحمه الله) এর কথায় সব সময় নূর থাকে। যদি মুকাল্লিদ ভাইয়েরা এমন ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতো, তবে মুসলিম উম্মাহ মাযহাবী গোঁড়ামী ও অনেক অনেক বিবাদ-বিতর্ক থেকে রক্ষা পেতো। আল্লাহ তা'আলার কাছেই তাওফীক চাচ্ছি।

فتوى المقلّد – মুকাল্লিদের (অন্ধ অনুসরণকারীদের) ফাতাওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ}

'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও' *(সূরা নাহল ১৬:৪৩)*।

এখানে أَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **أهل العلم** আহলুল 'ইলম বা বিদ্বানগণ। আর মুকাল্লিদ **أهل العلم** আহলুল 'ইলম বা বিদ্বানগণের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং সে নিজেই অন্যের অনুগামী। আবু উমার ইবনে আব্দুল বার ও অন্যান্য বিদ্বান বলেছেন,

أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. وأن العلم معرفة الحق بدليله

'সমস্ত মানুষ একমত যে, মুকাল্লিদ **أهل العلم** দের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর **علم** হলো দলীলসহ হক্ব জানা'।

ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) তেমনই বলেছেন, যেমনটা আবু আমর বলেছেন, নিশ্চয় বিষয়টি মূলতঃ তেমনই। কেননা, বিদ্বানগণের মাঝে এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, ইলম হলো দলীল থেকে অর্জিত জ্ঞান। পক্ষান্তরে দলীল ছাড়া জ্ঞান হলো তাক্বলীদ। তারপর ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) তাক্বলীদের মাধ্যমে ফাতাওয়া দেয়া জায়েয় হওয়ার ব্যাপারে তিনটি অভিমত বর্ণনা করেছেন।

প্রথম: তাক্বলীদের মাধ্যমে ফাতাওয়া দেয়া জায়েয নেই। কেননা, তাক্বলীদ কোন ইলম নয়। আর ইলম ছাড়া ফাতাওয়া দেয়া হারাম। এটিই হলো অধিকাংশ হাম্বলী অনুসারী ও অধিকাংশ শাফিঈদের অভিমত।

দ্বিতীয়: এটি নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জায়েয। আর যে বিষয়ে সে নিজেই অন্যকে ফাতাওয়া দেয়, সে বিষয়ে তার জন্য অন্যের তাক্বলীদ করা জায়েয নেই।

তৃতীয়: প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং মুজতাহিদ আলিমের অনুপস্থিতির কারণে তা জায়েয। এটিই হলো অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত এবং এর উপর বিদ্বানদের আমল রয়েছে।[১৫৪]এখানে তার কথা সমাপ্ত হলো।

১৫৪. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৭।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা যা লিখতে চেয়েছিলাম, তা এর মাধ্যমেই পরিসমাপ্তি ঘটছে। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের কথা ও কাজে 'সঠিকতা' ঢেলে দেন, আমাদের কর্মগুলোকে সফলতার মুকুট পরিয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি দানশীল, মহানুভব। আল্লাহ তা'আলা রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ও তার পরিবার-পরিজনের প্রতি।

المراجع–গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কামূসুল মুহীত (القاموس المحيط): ফীরোযাবাদী

২. আল কাওকাবুল মুনীর শারহু মুখতাসারিত তাহরীর (الكوكب المنير شرح مختصر التحرير): ইবনুন নাজ্জার

৩. মিনহাজুল উসূল (منهاج الأصول) ও তার ব্যাখ্যা: মতন বা মূলভাষ্য ইমাম বাইযাবী (রহিমাহুল্লাহ), কিন্তু এর ব্যাখ্যাকারী অজ্ঞাত।

৪. শারহু জামউল জাওয়ামি' ওয়া হাশিয়াতুহু (شرح جمع الجوامع وحاشيته): ব্যাখ্যা জালালুদ্দীন মাহাল্লী, টিকাকার বান্নানী।

৫. রওযাতুন নাযের ওয়া শারহুহা (روضة الناظر وشرحها): মূল কিতাব ইবনে কুদামা (রহিমাহুল্লাহ)-এর, ব্যাখ্যাকার আব্দুল কাদের বাদরান

৬. হুসূলূল মা'মুল মিন শারহিল উসূল (حصول المأمول من علم الأصول): মুহাম্মাদ সিদ্দীক

৭. আল মাদখাল ইলা মাযহাবে আহমাদ ইবনে হাম্বাল (المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل): আব্দুল কাদির ইবনে বাদরান

৮. ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইলমিল উসূল (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول): ইমাম শাওকানী

৯. ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية): সংকলক আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম

১০. আল মুসওয়াদ্দাহ ফি উসুলিল ফিক্বহ (المسودة في أصول الفقه): শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া, তার বাবা ও দাদা।

১১. যাদুল মা'আদ (زاد المعاد): ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)

১২. ই'লামুল মুওয়াক্বিঈন (إعلام الموقعين): ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ)

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল

৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু

৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী

৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৭. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ

৮. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী

৯. কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১০. আক্বীদাতুত তাওহীদ-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১১. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১২. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া

১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া

১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১৬. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৯. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২০. কাবীরা গুনাহ-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২১. একশত কাবীরা গুনাহ-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

২২. খিলাফত ও বায়'আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৪. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী

২৫. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

২৬. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ্ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ

২৭. হাদীছের মূলনীতি- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

২৮. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

৩০.মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম

৩১. যাকাতুল ফিতর-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

৩২. যাকাত ও দান খয়রাত- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির

৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৩৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

৩৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)-সাজ্জাদ সালাদীন

৩৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ

৩৮. ছ্বিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৩৯. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকাহ- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৪০. তাইসীরুল 'আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)-প্রথম খণ্ড

- আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্সাম